বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা : একটি পর্যালোচনা

কাজী সাহাবউদ্দিন*

১। পটভূমি

বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের কাছে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ড় গুর-ত্বপূর্ণ। নীতি নির্ধারকের কাছেও এটি একটি গুর-ত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী বা কর্মময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণকল্পে দেশের সকলের জন্য সকল সময়ে পর্যাপ্ত খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির সুযোগ থাকা। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তাকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রেক্ষিত থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা মানে হলো অভ্যন্ড়রীণ চাহিদা পূরণে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকা। আর ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে এর অর্থ সমাজের সকলের জন্য খাদ্য চাহিদা পূরণের সুযোগ থাকা (তাদের নিজস্ব উৎপাদন থেকে, বাজার থেকে অথবা সরকারের সরবরাহ বা হস্ড়ান্ড়র থেকে)। খাদ্যের পর্যাপ্ত লভ্যতা ও তা প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তার তৃতীয় উপাদান হলো খাদ্যের কার্যকর জৈবিক ব্যবহার, যা অনেকগুলো বিষয় যেমন পুষ্টি, শিক্ষা, উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবা ও পয়:নিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নিরাপত্তার এ তিনটি গুর-ত্বপূর্ণ উপাদান যেমন খাদ্য লভ্যতা বা প্রাপ্যতা, খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা এবং খাদ্যের কার্যকর ব্যবহারকে অবশ্যই পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা গুর-ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তাসহ কৃষি উন্নয়নের উপর বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ গুর-ত্ব দিয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির দ্র-ত প্রসারের কারণে অভ্যন্ড়রীণ খাদ্যশস্য বিশেষ করে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ চমকপ্রদ সফলতা দেখিয়েছে। আশির দশক থেকে ধানের উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে। সত্তরের দশকের শুর-তে ৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রকট। বর্তমানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হলেও দেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্ড়ে।

খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করলেও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি ও পানি) হ্রাস এবং উৎপাদনশীলতার অবনতি ইত্যাদি কারণে ভবিষৎ কৃষি প্রবৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। অধিকন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, কৃষি গবেষণায় অপ্রতুল বিনিয়োগ ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবার অবনতি আগত দশকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমস্যাকে আরও সংকটময় করে তুলবে। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে।

বন্যা, সাইক্লোন ও খরা ইত্যাদির উপর অভ্যন্ড়রীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও বহুলাংশে নির্ভরশীল, যা প্রায়শ উৎপাদন হ্রাস ও অপর্যাপ্ত খাদ্য লভ্যতার কারণ হয়ে থাকে। অধিকন্তু শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়েনি। দেশের ৩০ শতাংশের বেশি লোক খাদ্য-ভোগভিত্তিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করে। জীবনযাপনের অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন মেটানোসহ দৈনিক ২,১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য চাহিদা পূরণের সামর্থ্য তাদের নেই। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান

* প্রফেসরিয়াল ফেলো, বিআইডিএস।

ক্যালরি ঘাটতি ছাড়াও বাংলাদেশের জনগণের স্বাভাবিক খাদ্য অত্যন্ড় ভারসাম্যহীন অর্থাৎ সুষম নয় (পর্যাপ্ত চর্বি, তেল ও প্রোটিন ভোগসহ)। নারী ও শিশুদের পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হওয়ায় তারাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কৌশলের পর্যালোচনা বা পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও সরকারি খাদ্য বণ্টন সম্পর্কিত বিরাজমান ও নতুন সমস্যা মোকাবিলা ইত্যাদি বিষয়ে একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২০০৭-০৮ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের সময় খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও সারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অসহায় দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সমস্যা সমাধানকল্পে অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং বিদ্যমান খাদ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ ও বণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক মনোযাগ পেয়েছে।

এ প্রবন্ধে খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষ করে খাদ্য লভ্যতা ও খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সম্পর্কিত নীতিমালার বিকাশ, প্রবণতা ও অবস্থা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোচনা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিকল্প নীতি ও প্রয়োজনীয় সরকারি পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণে সাহায্য করবে।

২। খাদ্য লভ্যতা (Availability of Food)

২.১। খাদ্যশস্যের অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন

খাদ্যের লভ্যতা অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন ও আমদানির উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান, গম, আলু, ডাল, তৈল বীজ, আখ, সবজি, ফল ও মসলা। এসব খাদ্য দেশের মোট খাদ্য ক্যালরি ও প্রোটিনের প্রায় ৮০ শতাংশের যোগান দিয়ে থাকে। মোট মাথাপিছু ক্যালরিতে ধানের অবদান ৭৪ শতাংশ, অন্যদিকে মোট প্রোটিন গ্রহণে গমের অবদান ৫৭ শতাংশ। প্রধান খাদ্য শস্যের উৎপাদন ধারা সারণি ২.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ২.১
প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি ধারা: ১৯৭০-২০১০

খাদ্যশস্য	উৎপাদন (০০০ টন)				প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	১৯৭০-৭২	১৯৯০-৯২	১৯৯৯-০১	২০০৯-১০	১৯৭১-২০০০	২০০১-২০১০
খাদ্যশস্য	১০,৫০৪	১৯,১৪৩	২৫,৯৩৩	৩২,৮৭৬	৩.১০	২.৬৮
ধান	১০,৩৯৩	১৮,১৫৭	২৪,১২৬	৩১,৯৭৫	২.৯০	৩.২৫
গম	১১১	৯৮৬	১,৮০৭	৯০১	১০.১০	-৫.০১
আলু	১,৬৩৭	১,৭১৫	৩,৩৪২	৭,৯৩০	২.৫০	১৩.৭৩
চিনি	১,৩৬৭	৯৯১	৯৯৫	৫৮৫	-১.২০	-৪.১২
ডাল	৩৭৬	৫১৮	৩৭৯	২১৮	০.০৩	-৪.২৫
তৈলবীজ	২৫০	৪৬৬	৩৮২	৩৭৭	২.৩০	-০.১৩
শাকসবজি	১,১২০	১,৩৫৪	১,৭৯৪	২,৯৯৩	১.৪০	৬.৬৮

উৎস: হোসেন ও দেব (২০০৯); সংশোধিত (updated)।

উচ্চ ফলনশীলন জাত আবাদের কারণে ধান উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এটা প্রধানত সম্ভব হয়েছে বোরো মৌসুমে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা প্রসারের কারণে।[১] আশির দশকে ধান উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমতালে হয়েছে এবং তার পর থেকে এ হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে উলেণ্ঢখযোগ্য মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিকূল পরিবেশ এলাকায় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তার প্রসার না হলে প্রবৃদ্ধির এ হার ধরে রাখা যাবে না। গম উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে অনুকূল কৃষি আবহাওয়া বিরাজমান নেই, যা প্রধানত দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে যেখানে শীতকাল দীর্ঘতর হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও গত তিন দশকে গমের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে— ১৯৭১-২০০০ সময়কালে ১০ শতাংশের বেশি হারে উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে প্রবৃদ্ধি উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে কমে গেছে এবং নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। মোট খাদ্য শস্য উৎপাদনে গমের অবদান ৩ শতাংশেরও কম। সাম্প্রতিককালে ভূট্টা গমের জায়গা দখল করে নিয়েছে। এর কারণ হলো গমের তুলনায় ভূট্টার ফলন বেশি হয়; এটির ফলন লাভজনক এবং এটি বাংলাদেশের কৃষি-প্রতিবেশ উপযোগী।[২]

উৎপাদনের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় হয়ে ওঠেছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় এর গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে মার্চ-জুন সময়ে দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যে বোরো ধান (গমসহ) এর অবদান প্রায় ৬০ শতাংশ। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনে এর অবদান ছিল ২৫ শতাংশেরও কম।[৩] উৎপাদনের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনের কারণে খাদ্যমূল্যের ঋতুভিত্তিক ওঠানামা সহজতর (smoothening) হয় (সাহাবউদ্দিন ও দেব ২০১০)।

ডাল জাতীয় শস্য, তৈলবীজ এবং আখের উৎপাদন এলাকা কমানোর মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দ্র"ত প্রসার অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ডাল জাতীয় শস্য এবং তৈলবীজ প্রোটিনের গুর"ত্বপূর্ণ উৎস, বিশেষ করে গরিবদের জন্য। এসব শস্যের উৎপাদন হ্রাস জনগণের পুষ্টির ভারসাম্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ডাল জাতীয় শস্য, আখ এবং তৈলবীজের উৎপাদন হ্রাস পেলেও আলু ও সবজির উৎপাদন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ২.১)।[৪]

মাছ চাষের জন্য বাংলাদেশে যথেষ্ট জৈবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। পুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জনগণের খাদ্যাভাসে মাছ গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাছ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি, যা সত্তরের দশকে মন্থর ছিল, আশির দশকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সাম্প্রতিককালে পুকুরে মাছ চাষের দ্র"ত প্রসারের কারণে আরও বৃদ্ধি পায়। পোলট্রি শিল্পের প্রসার সত্ত্বেও মাংস ও দুধের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়। কিন্তু মাংস ও দুধের চাহিদা দ্র"ত বাড়ছে মূলত জনগণের আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। মানসম্মত পশু খাদ্যের অভাব, এভিয়ান ফ্লু ও অন্যান্য পশু সম্পর্কিত রোগের ঝুঁকি এবং দুর্বল বিপণন কাঠামো ইত্যাদি কারণে পশুপালন ও হাঁসমুরগি পালন এবং এদের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ড় হয়েছে (সাহাবউদ্দিন ও অন্যান্য ২০১২)।

২.২। খাদ্য আমদানি

---

[১] আবাদকৃত মোট জমির প্রায় দু-তৃতীয়াংশ সেচের মাধ্যমে চাষের আওতায় রয়েছে। অগভীর নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্প ইত্যাদিতে বেসরকারি বিনিয়োগের কারণে এসব সেচ সুবিধার উন্নয়ন হয়েছে। ধান উৎপাদন এলাকার প্রায় তিন-চতুর্থাংশে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়। গভীর বন্যা হয় এমন এলাকায়, হাওর এলাকায় এবং লবণাক্ত প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় কৃষকরা এখনও কম ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে থাকে। ধান উৎপাদনে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে তার প্রায় ৯০ শতাংশ ধান চাষের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে হয়েছে।

[২] সত্তর, আশি ও নব্বই দশকে ভূট্টার উৎপাদন কার্যত প্রায় ৩,০০০ টনে স্থির ছিল। তবে দেশের পোল্ট্রি খাবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে ২০০১-২০০৯ সময়কালে ভূট্টার উৎপাদন উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। যেমন ভূট্টার উৎপাদন ২০০০-২০০১ সালের ১০,০০০ টন থেকে বেড়ে ২০০৫-০৬ সালে ৫২২,০০০ মেট্রিক টনে এবং ২০০৯-১০ সালে ৮৮৭,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়।

[৩] কৃষকরা ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে বর্ষা মৌসুমের আমন ধান থেকে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। আগে এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তাদেরকে এক বছর অপেক্ষা করতে হতো।

[৪] ২০০১-২০১০ সময়কালে আলু ও সবজির উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৭৩ ও ৬.৬৮ শতাংশ।

জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা কেবল অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না; আমদানির (এবং রপ্তানির) উপরও নির্ভর করে।[৪] ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রায় সকল ধরনের খাদ্য আমদানির উপর দেশ নির্ভরশীল। সাধারণত প্রতিবছর প্রায় পাঁচ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়; তবে বন্যা ও খরাজনিত কারণে যেসব বছরে ফলন কম হয় সেসব বছরে আমদানির পরিমাণ উলেণ্ডখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। বন্যা বা খরার কারণে ১৯৭৩-৭৫ এবং ১৯৯৮-৯৯ সময়কালে বাংলাদেশ ২ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করে। ১৯৯৮ সালে ভয়াবহ বন্যার পর বাংলাদেশ প্রায় ৩ মিলিয়ন টন চাল আমদানি করে। আবার কোনো কোনো বছর (১৯৯১,২০০০) বাম্পার ফলনের কারণে ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ঘোষণা দেয়া হলেও ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধনশীল চাহিদার কারণে সরকারকে পরবর্তীকালে আমদানি নির্ভর হতে হয় (হোসেন ও দেব ২০০৯)।[৫]

অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য সাহায্য হ্রাসের কারণে গমের বাণিজ্যিক আমদানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] গম আমদানি সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে ১ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে আশির দশকের প্রথমার্ধে ১.২ মিলিয়ন টনে এবং ২০০০-০২ সময়কালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয় এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ সালে গম আমদানির পরিমাণ ২.৫ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়, যা মূলত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্যান্য খাদ্য উপাদানের যেমন তৈল, ডাল, চিনি, দুধ, ফল ইত্যাদির আমদানিও দ্রুত বাড়ছে। এসব আমদানির কারণে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে শস্য বহুমুখীকরণের প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, যদিও তা এখনও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি।

২.৩। মাথাপিছু লভ্যতা এবং খাদ্য আমদানি নির্ভরতার ধারা

মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও খাদ্যশস্যের আমদানি নির্ভরতা এবং গত তিন দশকে তাদের পরিবর্তনের ধারা সারণি ২.২ এ দেখানো হলো।

আশির দশক ও নব্বই দশকের প্রথমার্ধে মাথাপিছু খাদ্যশস্য লভ্যতা ১৬০ কিলোগ্রামে স্থির ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মাথাপিছু লভ্যতার পরিমাণ উলেণ্ডখযোগ্যভাবে বেড়েছে। খাদ্যশস্য বিশেষ করে ধানের উপর আমদানি নির্ভরতা আশির দশকের তুলনায় নব্বইয়ের দশকে ও পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। আর তা সম্ভব হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে ধান উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির কারণে। আশি ও নব্বই দশকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের বেশিরভাগই ছিল গম (খাদ্য সাহায্য আকারে প্রাপ্ত)। বর্তমানে গমের ঘাটতি চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় গমের সিংহভাগ বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আমদানি হয়ে থাকে। বিগত তিন দশকে অদানাদার খাদ্যশস্যের মাথাপিছু লভ্যতা সারণি ২.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ২.২

---

[৪] বাংলাদেশ অল্প কিছু সংখ্যক খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে যেমন হিমায়িত খাদ্য চিংড়ি), প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হর্টিকালচারাল দ্রব্য, সবজি এবং সুগন্ধী চাল।

[৫] চাল আমদানি বেড়ে যাওয়ার কারণে সাম্প্রতিককালে চাল উৎপাদন বিষয়ে সরকারি তথ্যের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ২০০৫ সালে পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের নমুনা জরিপ (National Level Sample Survey) থেকে দেখা যায় যে, আমন ধান উৎপাদনের এলাকা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রন্থে (Statistical Yearbook 2006) উলেণ্ডখিত পরিমাণের চেয়ে ১ মিলিয়ন হেক্টর কম। যদি জরিপের উপাত্ত সঠিক হয়ে থাকে তবে বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ সরকারি পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত পরিমাণের চেয়ে ৩ মিলিয়ন টন কম হবে। কার্যকর নীতি প্রণয়নের জন্য একই উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তা নিরসন করতে হবে (হোসেন ও দেব ২০০৯)।

[৬] অভ্যন্ড়রীণ খাদ্য চাহিদা পূরণে খাদ্য সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম কয়েক বছর দেশে প্রকট খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং এ ঘাটতির বেশিরভাগই পূরণ করা হতো পিএল ৪৮০ এর অধীনে প্রাপ্ত গম আমদানি থেকে। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৭ সময়কালের মধ্যে খাদ্য সাহায্য হিসেবে বাংলাদেশে ১.৩ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্যশস্য এসেছে, যা ছিল মোট খাদ্যশস্য আমদানির ৩৫ শতাংশের বেশি। সাম্প্রতিককালে খাদ্য সাহায্য কমে যাওয়ার কারণ হলো গমের অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন বেড়ে যাওয়া, বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ এরূপ কর্মসূচি প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশে দানাদার খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মাথাপিছু লভ্যতা এবং আমদানি নির্ভরতা: ১৯৮০/৮১-২০০৯/১০

সময়কাল	মাথাপিছু লভ্যতা (কেজি) (৫ বছরের গড়)	মোট লভ্যতার শতাংশ হিসেবে মোট আমদানি (৫ বছরের গড়)
১৯৮০/৮১-১৯৮৪/৮৫	১৬৪	১১.৩
১৯৮৫/৮৬-১৯৮৯/৯০	১৬২	১১.২
১৯৯০/৯১-১৯৯৪/৯৫	১৬৩	৮.৪
১৯৯৫/৯৬-১৯৯৯/০০	১৭৮	১১.৯ (৯.৩)
২০০০/০১-২০০৪/০৫	১৯৮	৯.৫
২০০৪/০৫-২০০৯/১০	২২৪	৮.৯

উৎস: মুজেরী ও সাহাবউদ্দিন (২০১২)।

টীকা: বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা ১৯৯৮/৯৯ সাল বাদে গড় আমদানির পরিমাণ নির্দেশ করছে কেননা ১৯৯৮ সালের বন্যা ও তৎজনিত শস্যের ক্ষয়ক্ষতির কারণে উক্ত বছরে ৩.৪৮ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল ।

সারণি ২.৩

দানাদার শস্য বহির্ভূত অন্যান্য খাদ্যশস্যের মাথাপিছু লভ্যতা: ১৯৮০/৮১-২০০৯/১০

সময়কাল	মাধাপিছু লভ্যতা (কেজি) (৫ বছরের গড়)							
	ডাল	ভোজ্য তেল	শাকসবজি	আলু	মসলা	চা	চিনি	ফলমূল
১৯৮০/৮১-১৯৮৪/৮৫	৩.৬৪	২.৬৯	২০.৬৬	১১.৯৭	৩.৪৫	০.১০	১.৭৬	১৬.২৪
১৯৮৫/৮৬-১৯৮৯/৯০	৫.৩১	৩.৮৭	১৯.৬১	১০.৭৩	৩.৩২	০.১৫	১.৩১	১৪.৫২
১৯৯০/৯১-১৯৯৪/৯৫	৫.১৬	৩.৪৯	২১.৮২	১১.৯৮	৩.২৯	০.২২	১.৯৩	১৩.৯৬
১৯৯৫/৯৬-১৯৯৯/০০	৪.৫৪	৬.৯৭	২৭.১২	১৬.৩০	৩.১৩	০.২৫	১.৬৩	১৩.৩০
২০০০/০১-২০০৪/০৫	৩.৫৭	১২.২৭	৩৮.৯২	২৫.১৯	৩.৮৮	০.৩২	১.১৯	১৩.৫৯
২০০৫/০৬-২০০৯/১০	৩.২৯	১৩.৫৭	৫৪.৫৮	৩৯.৮২	১১.৪২	০.৩৬	১.০৪	২৮.২৫

উৎস: মুজেরী ও সাহাবউদ্দিন (২০১২)।

আশির দশকের শুর"তে ভোজ্য তেলের মাথাপিছু লভ্যতার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তারপর থেকে এ লভ্যতার পরিমাণ প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে। এর কারণ হলো অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার তুলনায় আমদানি বেড়ে যাওয়া (সারণি ২.৪)। আশির দশকে ডালের মাথাপিছু লভ্যতা বেড়ে গেলেও নব্বইয়ের দশক ও গত দশকে এর নিগামী ধারা লক্ষ করা যায়। চিনির মাথাপিছু লভ্যতা আশি ও নব্বই দশকের প্রথমার্ধে ওঠানামা করলেও নব্বই দশকের প্রথমার্ধে ও গত দশকে নিগামী ধারা পরিলক্ষিত হয়। আশির দশকে সবজির মাথাপিছু লভ্যতা কিছুটা হ্রাস পেলেও নব্বই দশক ও গত দশকে একটি সুস্পষ্ট ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

আলুর মাথাপিছু লভ্যতা আশির দশক ও নব্বই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ড় স্থিতিশীল ছিল কিন্তু তারপর থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি। বস্তুত আলুর মাথাপিছু লভ্যতা গত তিন দশকে তিন গুণের বেশি বেড়েছে। মসলার মাথাপিছু লভ্যতা গত তিন দশকে কার্যত অপরিবর্তিত ছিল তবে সাম্প্রতিককালে উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ড় ফলের মাথাপিছু লভ্যতা বহুলাংশে অপরিবর্তিত ছিল। অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে ২০০৫-২০১০ সময়কালে এর লভ্যতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চা এর মাথাপিছু লভ্যতার ক্ষেত্রে গত তিন দশকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

সারণি ২.৪

দানাদার শস্যবহির্ভূত অন্যান্য খাদ্যশস্যের আমদানি নির্ভরতা: ১৯৮০/৮১-২০০৯/১০

বছর	আমদানি নির্ভরতা (%) (৫ বছরের গড়)					
	ডাল	ভোজ্য তেল	আলু	মসলা	চিনি	ফলমূল
১৯৮০/৮১-১৯৮৪/৮৫	০.৬৫	৯১.১৬	০.০৫	১.১৬	১.০৬	০.৬৮
১৯৮৪/৮৫-১৯৮৯/৯০	৬.৫৯	৯২.৮৪	০.১৯	১.০৪	০.৯৩	১.২৭
১৯৯০/৯১-১৯৯৪/৯৫	১১.৯৬	৯১.৬১	০.০৫	৬.২৬	০.৮২	১.২৯
১৯৯৫/৯৬-১৯৯৯/০০	১৬.৬৯	৯৮.০১	০.০৪	২.২০	২.৩৭	৩.২৮
২০০০/০১-২০০৪/০৫	২৮.৭৪	৯৫.১৮	০.০৯	২.৫৮	৩.৬৭	২.৮৬
২০০৫/০৬-২০০৯/১০	৪৫.৪৩	৯৩.৩৬	০.১৪	১১.১৯	২.৪৮	০.৭৩

উৎস: মুজেরী ও সাহাবউদ্দিন (২০১২)।
টীকা: বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মোট লভ্যতার শতাংশ হিসেবে আমদানি নির্ভরতার হিসাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভোজ্যতেল আমদানির উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। দেশের ভোজ্যতেলের ৯০ শতাংশের বেশি আমদানি করা হয়। গত তিন দশক জুড়েই এ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।[৮] মোট লভ্যতায় মসলা আমদানির অংশ ও আমদানি নির্ভরতা গত তিন দশকে পরিমাণে কম থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা বেড়েছে। মোট লভ্যতায় ফল আমদানির অংশ কম হলেও আশি ও নব্বই দশকে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে তা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। বিগত তিন দশকে আলু আমদানি নির্ভরতা অনুলেণ্ঢখযোগ্য (এক শতাংশের কম)। এর কারণ হলো এ সময়কালে আলুর উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি। আশির দশকে ডালের ক্ষেত্রে কম আমদানি নির্ভরতা লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে তা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে দেশের ডালের চাহিদার প্রায় অর্ধেক আমদানি করা হয়।

২.৪। প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ও সম্ভাবনা

খাদ্যের লভ্যতা প্রধানত অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন, বাণিজ্য ও মজুদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। জনগণের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশ্ব খাদ্য বাজার থেকে আমদানি এবং খাদ্যশস্যের মজুদ করার মাধ্যমে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রযুক্তিগত অবসাদ (technology fatigue), জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং অন্যবিধ কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা হ্রাস বা স্থবিরতা ইত্যাদি রোধ করার উপর জোর দেয়া একান্ড় প্রয়োজন (নন্দকুমার এবং অন্যান্য ২০১০)।

কৃষি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমসংকোচন ও অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাবার যোগাতে বাংলাদেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ধান। আশির দশক থেকে সেচের মাধমে চাষকৃত উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তবে প্রধান অন্য জাতের ধানের (আমন) ফলনও বন্যা ও খরার কারণে ধীরগতিতে বাড়ছে।

কৃষি শস্য নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। দেশে লক্ষ লক্ষ প্রান্ড়িক ও ক্ষুদ্র চাষী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে শস্য বহুমুখীকরণ এখনো সীমিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়শ উৎপাদনের ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক এলাকায় ভূমি/মাটির অবক্ষয় ও বীজের নিম্মান ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবের কারণে নতুন

[৮] ভোজ্য তেলের উৎপাদন ১৯৮০-৮১ সালের প্রায় .২০ লাখ টন থেকে বেড়ে ২০০৯/১০ সালে ১.৪৫ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ বিগত তিন দশকে ১.২৫ লাখ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে একই সময়কালে ভোজ্য তেল আমদানির পরিমাণ বেড়েছে ১৭.৪২ লাখ টন (১৯৮১/৮২ সালের প্রায় ১.৩২ লাখ টন থেকে বেড়ে ২০০৯/১০ সালে ১৮.৭৪ লাখ টনে উন্নীত হয়) (বিবিএস ২০১১)।

প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। বোরো ধানের চাষ ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, যার সম্ভাবনা ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। অধিকন্তু সেচের পানির ব্যবহারের কম দক্ষতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন (climate change) শস্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতে এসব নেতিবাচক প্রভাবকে আরও তীব্র করবে।[৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব এলাকায় ভূ-উপরিস্থিত পানির পর্যাপ্ততা রয়েছে সেসব এলাকায় বোরো ধানের চাষ প্রসার করা যেতে পারে। উৎপাদনের খরচ কম রাখতে এবং প্রাপ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারের পক্ষে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। পক্ষান্তরে যেহেতু বোরো ধান বিদ্যমান প্রযুক্তির সম্ভাবনার সীমায় পৌঁছে গেছে সেহেতু ধানের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমন ধান থেকে ফলন সর্বোচ্চকরণই হবে প্রধান লক্ষ্য। উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের চাষ এলাকার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে, তবে এজন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন, প্রসারণ করা এবং বিপণন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

উচ্চ ফলনশীল এবং খরা, পানি ও লবণাক্ত সহিষ্ণু (salinity tolerent) জাত উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এসব জাত গভীরপানি (deepwater) এলাকার উপযোগী হবে এবং অল্প সময়েই পরিপক্ক (shorter maturity) হতে হবে। দেশে ইতিমধ্যে প্রতিকূল কৃষি পরিবেশ সহিষ্ণু কিছু উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব জাতকে দ্রুত জনপ্রিয় করার পাশাপাশি খাদ্য শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিবেশ-ভিত্তিক (ecology-specific) উন্নয়নে আরও গবেষণা প্রয়োজন। এছাড়া শস্য বিন্যাস (cropping pattern) এ পরিবর্তনসহ মাটির সমস্যা (problem soils) রয়েছে এমন এলাকার উপযোগী শস্য চিহ্নিত করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে, যার মূলে থাকবে river basin development। এটি কৃষি উন্নয়নে ভূউপরিস্থিত ও ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করবে। River basin development পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় ও চালের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে খাদ্য মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় ও গরিব লোকদের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বেসরকারি খাতকে খাদ্য আমদানির সুযোগ দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য স্বল্পতার সময়ে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আমদানি দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও খাদ্য মূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[১০] আমন ও বোরো ফলনের মূল্যায়ন এবং বিশ্ব বাজারের বিদ্যমান মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে শুল্ক হার ও ভর্তুকি জাতীয় বাজেটে স্থির করে সরকারের শুল্ক ও ভর্তুকি নীতি প্রণয়ন করা উচিত। বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের, বিশেষ করে ভারতের, কৃষি বাণিজ্য নীতির নিয়মিত পরিবীক্ষণ সরকারকে সঠিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে।

২.৫। খাদ্য লভ্যতা বৃদ্ধিকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

[৯] সম্প্রতি এক সমীক্ষা বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের (খরা, বন্যা, লবণাক্ততা) প্রভাব পরিমাপ করেছে। দেখা গেছে, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ১.২ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন হ্রাস পাবে (যা বার্ষিক ধান উৎপাদনের প্রায় ৪%)।

[১০] ২০০৭-২০০৮ সালের খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, উদারীকৃত বাণিজ্য ব্যবস্থা খাদ্যশস্যের মূল্য ও খাদ্যশস্যের যোগানের স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বস্তুত যখন অভ্যন্তরীণ বাজারে ঘাটতি থাকে তখন খাদ্যশস্যের উৎস হিসেবে বিশ্ব বাজারের উপর আর নির্ভর করা যেতে পারে না। এজন্য বাংলাদেশের মতো খাদ্য আমদানিকারক দেশের জন্য স্বনির্ভরতা (self-reliance) থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (self-sufficiency) নীতি বা কৌশল গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে (দেব ও অন্যান্য ২০০৯)।

খাদ্যের লভ্যতা বাড়াতে অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং খাদ্য শস্যের আমদানি বাড়াতে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উৎপাদন বাড়ানোর মূল চালিকাশক্তি হলো উন্নত জাতের শস্য উদ্ভাবন ও এদের বিস্ড়ার এবং কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে অগভীর নলকূপের প্রসারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থার প্রসার। জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থায় (NARS) ৫০০ এর বেশি উন্নত জাতের শস্যের উদ্ভাবন ঘটানো হয়েছে, যদিও খুব কম সংখ্যক জাতই দেশের কৃষকদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কম ফলনশীল জাতের পরিবর্তে এসব উন্নত জাত আবাদ করায় ফলন বেড়েছে, উৎপাদন খরচ কমেছে এবং লাভের পরিমাণ বেড়েছে। ফলে বিগত তিন দশকে কৃষিজ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য (real price) কমেছে।

সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আশির দশকের শেষ দিক থেকে সেচের আওতাধীন জমির এলাকা দ্র“ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিনের আমদানি উদারীকরণ এবং আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্র সেচ যন্ত্রপাতির, বিশেষ করে অগভীর নলকূপের উপর থেকে standardisation সংক্রান্ড় নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে ক্ষুদ্র সেচে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে মোট সেচকৃত এলাকার ৭০ শতাংশের বেশির সেচের উৎস হচ্ছে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার।[১] পরবর্তীতে সেচের পানির একটি বাজার (water market) সৃষ্টি হয়েছে যা command এলাকার সংলগ্ন পণ্ডটে সেচ সুবিধা প্রদান করে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক কৃষকদের শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে বোরো ধান আবাদের জন্য সেচ সুবিধা দেয়। গভীর নলকূপের ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে রেখে দিয়েছে, কেননা ব্যক্তি খাতে তা ছেড়ে দেয়া বেশ কঠিন। সেচে ভর্তুকি প্রদান করা হয় বিদ্যুৎ ও ডিজেলের মাধ্যমে যা শুষ্ক মৌসুমে ধান চাষের প্রধান উপকরণে পরিণত হয়েছে।

সরকার কৃষির অন্যান্য উপকরণ যেমন বীজ ও সারের ক্ষেত্রে নীতির সংস্কার সাধন করেছে। বাংলাদেশের বীজের বাজারে দ্বৈত কাঠামো রয়েছে— প্রধান শস্য যেমন ধান, গম, পাট, আলু ও আখকে নোটিফাইড (notified) শস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব শস্যের উদ্ভাবন, রক্ষণাবেক্ষণ, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ইত্যাদি কাজ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে। বীজ ব্যবসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা ননোটিফাইড (non-notified) শস্যের সরবরাহে সীমিত রাখা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সরকার বেসরকারি খাতকে হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানির সুযোগ দেয়। সম্প্রতি কিছু বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করেছে। এ স্মারক অনুসারে তারা ব্রিডিং বীজ সংগ্রহ করে বিতরণের জন্য ধানের ফাউন্ডেশন (foundation) এবং সার্টিফাইড (certified) বীজ উৎপাদন করবে। ফলে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বীজের বাজার উলেণ্টখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

সার, সেচ এবং উন্নত বীজ কৃষি উৎপাদনের তিনটি অপরিহার্য উপকরণ। এগুলোর সংগ্রহ ও বিতরণ এক সময় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ড় ছিল। আশির দশকের গোড়া থেকে নীতি সংস্কারের লক্ষ্য ছিল সরকারি হস্ড়ক্ষেপ কমানো (হোসেন ১৯৯৬)। সারের বিপণন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ শুর“ হয় ১৯৭৮ সালে এবং আশির দশকের প্রথমদিকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৮৭ সালের জুলাই এর শুর“ থেকে বেসরকারি ডিলারদেরকে ফ্যাক্টরি হতে এবং বিএডিসি সরবরাহ কেন্দ্র হতে হ্রাসকৃত মূল্যে সার সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৯২ সালের দিকে বিএডিসি পাইকারি ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং ব্যক্তি খাতকে সার সংগ্রহ, সার আমদানি (ইউরিয়া বাদে) এবং অভ্যন্ড়রীণ বাজারে বিতরণের অনুমতি দেয়। ১৯৯২ সালে পটাশ ও ফসফেট সারের উপর থেকে

[১] ক্ষুদ্র সেচের অন্ড়র্ভুক্ত হলো অগভীর নলকূপ, ডিপ সেট অগভীর নলকূপ এবং গভীর নলকূপ (যা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে) এবং লো-লিফট পাম্প (যা ভূউপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে)। অন্যদিকে বৃহৎ সেচ বলতে বোঝায় ভূউপরিস্থিত পানির উপর নির্ভরশীল বৃহৎ আকারের সেচ প্রকল্প ।

ভর্তুকি তুলে নেয়া হয়। তবে ১৯৯৫ সালের বোরো মৌসুমে অভ্যন্ড়রীণ বাজারে সারের তীব্র সংকট দেখা দেয়ার পর ১৯৯৬ সালে সারে ভর্তুকি পুনরায় চালু করা হয়। সরকার কার্যত ব্যক্তি খাত থেকে পাইকারি সরবরাহকে নিজ হাতে তুলে নেয় এবং সারের দাম স্থিতিশীল রাখতে বাফার স্টক (buffer stock) গড়ে তোলা শুর" করে। সম্প্রতি সরকার নন-ইউরিয়া সার যেমন ট্রিপল সুপার ফসফেট (TSP) এবং মিউরিয়েট অব পটাশের (MP) উপর অধিক পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করছে যা মাটির উর্বরতা রক্ষার প্রয়োজনে রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

সরকারের গৃহীত উপরোক্ত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ কৃষি উপকরণের বাজার সম্প্রসারণে, উপকরণের মূল্য স্থিতিশীলকরণে এবং উন্নত প্রযুক্তির প্রসারণে, বিশেষ করে দেশের ধান উৎপাদনে, ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

৩। খাদ্য প্রাপ্তি

৩.১। খাদ্য ভোগ

পরিবার পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্তির আলোচনায় গড় মাথাপিছু স্ড়রে বা সামগ্রিক পর্যায়ে খাদ্য ভোগ ও পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য প্রাণশক্তির (energy requirement) একমাত্র উৎস চাল ও গম নয়; মোট প্রাণশক্তি গ্রহণের প্রায় ৮০ শতাংশের যোগান দেয় দানাদার শস্য। ফলে মোট প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাণশক্তিতে অদানাদার খাদ্যশস্যের অবদান রয়েছে। মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদি ধারা সারণি ৩.১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩.১

বাংলাদেশে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদি ধারা: ১৯৭৩/৭৪-২০১০

(কিলো ক্যালরি/মাথাপিছু/দৈনিক)

বছর	গ্রাম	শহর	জাতীয় পর্যায়
১৯৭৩/৭৪	১৮৮৫.০	১৯৪৫.০	-
	(১০০.০)	(১০০.০)	
১৯৮১/৮২	১৯০৫.৩	২০৪৭.৫	১৯২৫.২
	(১০১.১)	(১০৫.৩)	(১০০.০)
১৯৮৩/৮৪	২১১২.৬	২০২০.২	২১০৯.৯
	(১১২.১)	(১০৩.৯)	(১০৯.৬)
১৯৮৫/৮৬	২২০৩.৪	২১০৭.০	২১৯২.২
	(১১৬.৯)	(১০৮.৩)	(১১৩.৯)
১৯৮৮/৮৯	২২১৬.৮	২১৮৩.২	২২১৫.৩
	(১১৭.৬)	(১১২.৩)	(১১৫.১)
১৯৯১/৯২	২২৬৬.৮	২২৫৮.১	২২৬৫.৬
	(১২০.৩)	(১১৬.১)	(১১৭.৭)
১৯৯৫/৯৬	২২৫১.০	২২০৯.০	২২৪৪.০
	(১১৯.৬)	(১১৩.৬)	(১১৬.৬)
২০০০	২২৬৩.০	২১৫০.০	২২৪০.০
	(১২০.১)	(১১০.৫)	(১১৬.৪)
২০০৫	২২৫৩.২	২১৯৩.৮	২২৩৮.৫
	(১১৯.৫)	(১১২.৮)	(১১৬.৩)
২০১০	২৩৪৪.৬	২২৪৪.৫	২৩১৮.৩
	(১২৪.৪)	(১১৫.৪)	(১২০.৪)

উৎস: চৌধুরী ও ডেল নিন্নো (১৯৯৮), বিবিএস (২০০০, ২০০৭ ও ২০১১)।

টীকা: বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যাগুলো সূচককে নির্দেশ করছে ১৯৭৩-৭৪ সালকে ভিত্তি বছর ধরে। জাতীয় পর্যায়ের সূচকসমূহ ১৯৮১-৮২ সালকে ভিত্তি বছর ধরে হিসাব করা হয়েছে ।

সারণি ৩.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৯১-৯২ সময়কালের মধ্যে গ্রাম ও শহর এলাকায় মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে যদিও মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫ সময়কালে সামান্য কমেছে। ২০০০ সালে গ্রাম এলাকায় মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণ সামান্য পরিমাণে বাড়লেও শহর এলাকায় উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণে কমেছে, যার ফলে জাতীয় পর্যায়ে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। পক্ষান্ড়রে ২০০৫ সালে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ শহর এলাকায় কিছুটা বাড়লেও গ্রাম এলাকায় কমেছে, যা আবার জাতীয় পর্যায়ে ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ২০১০ সালে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে জাতীয় পর্যায়ে ক্যালরির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মাথাপিছু গড় ক্যালরি গ্রহণ নব্বই দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ড় ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও তার পর থেকে কিছুটা নিম্নমুখী হয় যা ২০০৫ সাল পর্যন্ড় অব্যাহত থাকে (সাহাবউদ্দিন ২০১০)। তবে সাম্প্রতিককালে মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এ অব্যাহত হ্রাস প্রবণতার চিত্র বদলে যায়।

খাদ্য ভোগের পর্যাপ্ততা

গরিবদের খরচের একটি বড় অংশ খাদ্য ক্রয় করতে ব্যয় হয়। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) ২০০৫ অনুসারে জনসংখ্যার দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ তাদের আয়ের ৭০ শতাংশ খাবারের জন্য ব্যয় করে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দিনে ১৮০৫ ক্যালরির কম খাবার গ্রহণ করে যা ন্যূনতম ক্যালরী গ্রহণের মাত্রার চেয়ে কম। সারণি ৩.২-এ বিভিন্ন খাদ্য ভোগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে এবং জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত গড়পড়তা মানুষের জন্য ন্যূনতম খাদ্য আবশ্যকতার সাথে ভোগের পরিমাণের তুলনা করা হয়েছে।

সারণি ৩.২

বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ভোগের পরিমাপ: ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৫

(গ্রাম/মাথাপিছু/দৈনিক)

খাদ্যদ্রব্য	সুষম পুষ্টির জন্য ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ	গ্রাম এলাকা				শহর এলাকা			
		১৯৮৩-৮৪	১৯৯১-৯২	২০০০-০১	২০০৫	১৯৮৩-৮৪	১৯৯১-৯২	২০০০-০১	২০০৫
ধান	৩৯০	৪২১	৪৮১	৪৭৯	৪৭৭	৩৫১	৪১৬	৩৮৩	৩৮৯
গম	১০০	৬৫	৪২	১৮	১২	৭৯	৫৫	৪০	২৮
সবজি ও আলু	২২৫	১৪০	১৭৬	১৯৩	২২১	১৭৯	২০৯	১৯৮	২২৮
ডাল	৩০	২৬	১৭	১৫	১৩	২২	২২	১৯	১৯
তেল ও চর্বি	২০	৭	৯	১১	১১	১১	১৬	১৮	১৮
মাছ	৪৫	২৯	৩২	৩৭	৪০	৩৯	৪৮	৪২	৫০
মাংস ও ডিম	৩৪	১০	১২	১৪	১৮	২২	২০	৩৪	৩২
দুধ	৩০	২২	১৮	২৯	৩২	৩৪	২৩	৩২	৩৬

উৎস: বিবিএস, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (বিভিন্ন বছর); বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (BNNC)।

মাথাপিছু চাল ভোগের পরিমাণ গ্রাম এলাকায় ন্যূনতম ভোগ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি যদিও টিউবার (tuber), শাকসবজি ও মাছের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ঘাটতি এবং মসলা, তৈল ও মাছ-মাংস জাতীয় খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এগুলো প্রোটিন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের (micronutrients) বড় উৎস। শহর এলাকায়ও প্রায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে ব্যতিক্রম হলো শহর এলাকায় দানাদার শস্যের মাথাপিছু ভোগ, বিশেষ করে চাল, গ্রাম এলাকার চেয়ে কম হলেও অন্যান্য বেশির ভাগ খাদ্যের মাথাপিছু ভোগ, বিশেষ করে মাছ-মাংস জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদির ভোগ, গ্রাম এলাকার চেয়ে বেশি। খাদ্যের ভোগের উপাদান থেকে দেখা যায়, গ্রাম এলাকার চেয়ে শহর এলাকায় খাদ্য ঝুড়ির (food basket) গুণগত মান অনেক উন্নত (হোসেন ও দেব ২০০৯)।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋতুগত ও আঞ্চলিক পার্থক্য

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তিনটি প্রধান মৌসুম জুড়েই কৃষি কর্মকান্ড, বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন, চলে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ও ভোগ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের কারণ হলো খাদ্য মূল্য ও আয় উভয়ের ওঠানামা। সাম্প্রতিককালে ধানের, বিশেষ করে বোরো ধানের প্রচুর উৎপাদন জুলাই মাসে খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতিকে (peak) বোরো ফসল পরবর্তী সময়ের মূল্যের নিম্নগতিতে (trough) পরিণত করেছে।[১২] বোরো মৌসুমে শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মজুরি আয়ও এ সময় বেড়ে যায়। ফলে কৃষি ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন এ সময়ে খাদ্য ভোগের মাত্রা রক্ষা করতে খাদ্য মূল্য ও আয়কে প্রভাবিত করে।

মার্চ-এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সময়কালে খাদ্য মূল্য অনেক চড়া থাকে। আমন ফসলের পূর্ব পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার কারণে মজুরি শ্রমের উপর নির্ভরশীল গ্রাম এলাকার ভূমিহীনরা দুর্ভোগের শিকার হয়। কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে শীতকালীন শস্যের উৎপাদন ও ফলন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যা পুষ্টির চাহিদার উপর চাপ কমায়। তথাপি আমন ফসলের পূর্বে লীন পিরিয়ড বিরাজমান থাকে এবং আমন ফসলের পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

খাদ্য ভোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পার্থক্য বিরাজ করে প্রধানত ভূমির উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে। বিআইডিএস পরিচালিত (চৌধুরী ১৯৯৫) পুষ্টিগত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, খাদ্য ভোগে আঞ্চলিক পার্থক্য মৌসুমভিত্তিক/ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।[১৩] খাদ্য গ্রহণের পরিমাণে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য এখনও ব্যাপক এবং এরূপ আঞ্চলিক পার্থক্য বিদ্যমান ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের চেয়ে বেশি।

৩.২। খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা

একটি পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তি প্রধানত নির্ভর করে সে পরিবারের আয়ের পরিমাণের উপর। জাতীয় আয়ের ধীর প্রবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা উচ্চ হারে বৃদ্ধির কারণে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু আয় অনেকটা স্থবির ছিল। ১৯৯০ সালের পর জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে— সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি ৬.০ থেকে ৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমেছে— সত্তর দশকের ৩.০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১.৫ শতাংশ। ফলে মাথাপিছু আয় বছরে গড়ে প্রায় ৪.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক খানা আয় ও ব্যয় জরিপের (HIES) ফলাফল থেকে দেখা যায়, আয়ের ক্ষেত্রে শহর-গ্রামের বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি আশির দশকে সহনীয় পর্যায়ে ছিল কিন্তু নব্বই দশকের শুরু থেকেই গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় এই বৈষম্য প্রকট ও তীব্রতর হয়েছে।[১৪] ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের উপর আয় প্রবৃদ্ধির প্রভাব সীমিত রয়ে গেছে।

দরিদ্রদের জীবনযাত্রার অবস্থার পরিবর্তন নির্ণয়ে প্রকৃত মজুরি হারের প্রবণতা, বিশেষ করে কৃষি শ্রম, প্রায়শ বিকল্প সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মজুরি হার চরম দরিদ্রদের আয়ের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করতে পারে কিন্তু মধ্যম/মাঝারি দরিদ্রদের আয়ের পরিবর্তনকে নয়। মধ্যম দরিদ্ররা

---

[১২] সত্তর দশকের তুলনায় আশি ও নব্বই দশকে খাদ্যশস্যের মূল্যের মৌসুমী ব্যবধান (seasonal price spread) উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। আমন ও আউস ধানের তুলনায় বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধি পাওয়ায় হলো খাদ্যশস্যের মূল্যের মৌসুমভিত্তিক পাথর্ক্যের কারণ (ডরস ও সাহাবউদ্দিন ১৯৯৯)।

[১৩] উৎপাদনের ভরা মৌসুমে (আমন ফসলের পর) গ্রাম এলাকায় মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ৮৮৪.৬ গ্রাম, যা মরা মৌসুমের পরিমাণের (৭৩৬.৯ গ্রাম ১৯৯০-৯১ সালে) চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে জরিপকৃত গ্রামগুলোতে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণের মধ্যেকার পার্থক্য প্রায় ৬৫ শতাংশ।

[১৪] এটি পরিমাপকৃত জিনি সহগে (Gini Coefficient) প্রতিফলিত হয়েছে, যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ০.৩৬ থেকে বেড়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে ০.৪৩ এ উন্নীত হয় এবং আরও বেড়ে ২০১০ সালে ০.৪৬ এ উন্নীত হয়। গ্রাম ও শহর এলাকায় এ বৃদ্ধির হার ১৯৮৩-৮৪ সালে যথাক্রমে ০.৩৫ ও ০.৩৭, ১৯৯৫-৯৬ সালে যথাক্রমে ০.৩৮ ও ০.৪৪ এবং ২০১০ সালে যথাক্রমে ০.৪৩ ও ০.৪৫ (বিবিএস কর্তৃক আয়-ব্যয়ের খানা জরিপ বিভিন্ন সময়কালে)।

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের মতো তাদের জীবিকা আয় করতে পারে, যেখানে চরম দরিদ্ররা তাদের আয়ের বড় অংশ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ থেকে পায়।[*] ১৯৮৩-১৯৮৪ সাল থেকে প্রকৃত মজুরি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে; ব্যতিক্রম কেবল বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির দুটো বছর (২০০৭ ও ২০০৮ সাল) কেননা তখন চালের দাম উল্লেণ্ঢখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল (সারণি ৩.৩)।

সারণি ৩.৩

বাংলাদেশে প্রকৃত কৃষি মজুরির ধারা: ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৮

বছর	নামিক মজুরি হার (টাকা/দিন)	দারিদ্র্য রেখা ডিফ্লেটর (২০০৩=১০০)	ধানের মূল্য ডিফ্লেটর(২০০৩=১০০)	প্রকৃত মজুরি (টাকা/দিন)	
				দারিদ্র্য রেখা ডিফ্লেটর	ধানের মূল্য ডিফ্লেটর
১৯৮৩-৮৪	১৯.৫৮	৩৮.৭০	৫৪.৫০	৫০.৫৯	৩৫.৯২
১৯৮৮-৮৯	৩২.৭১	৫৫.৭০	৭২.৬০	৫৮.৭৩	৪৫.০৫
১৯৯১-৯২	৪১.৭৭	৬৭.৮০	৮২.৮০	৬১.৬০	৫০.৪৫
১৯৯৫-৯৬	৪৫.৫৮	৭৮.২০	১০৩.০০	৫৮.২৯	৪৪.২৫
২০০০	৬৩.৬০	৯১.৫০	৯৬.৮০	৬৯.৫১	৬৫.৭০
২০০৩	৭২.২৩	১০০.০০	১০০.০০	৭২.৭৩	৭২.৭৩
২০০৪	৭৫.৮৩	১০৬.৭৫	১০৩.০৯	৭১.০৪	৭৩.৫৬
২০০৫	৮৪.৪২	-	১১৭.৩৬	-	৭১.৯৩
২০০৬	৯৪.৮৩	-	১২০.৯৯	-	৭৮.৩৮
২০০৭	১০৯.৫০	-	১৪৭.৮২	-	৭৪.০৮
২০০৮	১৩৫.৬৭	১৮৬.৮৮	২১৮.১০	৭২.৬০	৬২.২১

উৎস: ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৩ এর জন্য হোসেন ও দেব (২০০৯), ২০০৪ থেকে ২০০৮ এর জন্য বিবিএস থেকে নেয়া প্রকৃত মজুরি ও ধানের মূল্য বিষয়ক উপাত্তের ভিত্তিতে লেখকের নিজস্ব হিসাব; ২০০৪ এবং ২০০৮ সালের দারিদ্র্য রেখা আয় এর হিসাব হোসেন ও বায়েস (২০১০) থেকে নেয়া হয়েছে ।

প্রকৃত মজুরির গতিধারা বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত আয়ে প্রবেশগম্যতা এবং খাদ্য প্রাপ্তিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকৃত মজুরি বিষয়ক সময়ক্রমিক তথ্য সারণি ৩.৪ এ দেখানো হলো। প্রকৃত মজুরির সাধারণ ও খাতভিত্তিক সূচকসমূহ আশির দশক থেকেই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখাচ্ছে। তবে কৃষিখাতে প্রকৃত মজুরির সূচকের পরিমাপ ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ খাতের তুলনায় কম যদিও শ্রমশক্তির বেশিরভাগই কৃষিখাতে নিয়োজিত থাকে।

প্রকৃত মজুরির গতিধারা যারা কর্মে নিয়োজিত রয়েছে তাদের বেলায় প্রযোজ্য। সার্বিক অর্থনৈতিক সুযোগের (economic acceessibility) বিষয়ে ধারণা পেতে হলে দেশের বেকারত্বের হারের দিকে তাকানো দরকার। দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার ১৯৮৯ সালের ৪৩.৪ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩১.৯ শতাংশ হয়েছে এবং তা পরবর্তীকালে (২০০৯ সালে) আরও কমে ২৮.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটি গত দুই দশকেরও বেশি সময়কালের অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নতিকে নির্দেশ করে। তবে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হ্রাসের হার পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় গত দশকে কমেছে।

সারণি ৩.৪

প্রকৃত মজুরি সূচকের ধারা (১৯৬৯/৭০=১০০): ১৯৮০-২০০৯

বছর	সাধারণ	ম্যানুফ্যাকচারিং	নির্মাণ	কৃষি

[*] প্রকৃত মজুরি পরিমাপে সঠিক ডিফ্লেটরের ব্যবহারে কিছু সমস্যা রয়েছে।

১৯৮০/৮১	৮৭	৭৯	৯৪	৮৬
১৯৮১/৮২	৮৬	৮০	৯৬	৮৫
১৯৮২/৮৩	৮৮	৮২	৯৯	৮২
১৯৮৩/৮৪	৯০	৯৫	৯৯	৭৫
১৯৮৪/৮৫	৮৬	৯১	৯১	৭৫
গড়	**৮৭**	**৮৫**	**৯৬**	**৮১**
১৯৮৫/৮৬	৯৫	১০২	১০০	৮২
১৯৮৬/৮৭	১০২	১০৯	১০৬	৮৯
১৯৮৭/৮৮	১০৬	১০৮	১১৭	৯৩
১৯৮৮/৮৯	১০৭	১১০	১২০	৯২
১৯৮৯/৯০	১১০	১১৫	১১৩	৯৬
গড়	**১০৪**	**১০৯**	**১১১**	**৯০**
১৯৯০/৯১	১০৭	১১৪	১০৭	৯৫
১৯৯১/৯২	১০৭	১১৩	১০৪	৯৮
১৯৯২/৯৩	১১৩	১১৯	১০৯	১০৫
১৯৯৩/৯৪	১১৪	১২১	১০৬	১০৬
১৯৯৪/৯৫	১১১	১২১	১০০	১০৩
গড়	**১১০**	**১১৮**	**১০৫**	**১০১**
১৯৯৫/৯৬	১১৪	১২৩	১০৬	১০৪
১৯৯৬/৯৭	১২০	১৩০	১১১	১০৯
১৯৯৭/৯৮	১২২	১৩৭	১১৪	১০৭
১৯৯৮/৯৯	১১৮	১৩১	১১৩	১০২
১৯৯৯/০০	১২১	১৩৭	১১৬	১০৩
গড়	**১১৯**	**১৩২**	**১১২**	**১০৫**
২০০০/০১	১২৫	১৪২	১১৮	১০৭
২০০১/০২	১৩০	১৫০	১২১	১১২
২০০২/০৩	১৪১	১৬৯	১২৭	১১৮
২০০৩/০৪	১৪৬	১৭৭	১২৫	১২১
২০০৪/০৫	১৪৯	১৮১	১২৪	১২৩
গড়	**১৩৮**	**১৬৪**	**১২৩**	**১১৬**
২০০৫/০৬	১৪৯	১৮৩	১২৩	১২৪
২০০৬/০৭	১৫০	১৮৪	১২৪	১২৫
২০০৭/০৮	১৫৪	২০৬	১৪১	১৪০
২০০৮/০৯	১৭৪	২৪৩	১৭১	১৬৯
গড়	**১৫৭**	**২০৪**	**১৪০**	**১৩৯**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (বিভিন্ন বছর), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

সারণি ৩.৫

বাংলাদেশে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার, ১৯৮৯-২০০৯

বছর	প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার (শতাংশ)

	(১০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমশক্তির মধ্যে)
১৯৮৯	৪৩.৪
১৯৯০-৯১	৪২.৮
১৯৯৫-৯৬	৩৪.৬
১৯৯৯-২০০০*	৩১.৯
২০০২-২০০৩*	৩৪.০
২০০৫-২০০৬*	২৪.৫
২০০৯*	২৮.৭

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ (বিভিন্ন বছর) এবং কর্মসংস্থানের পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ২০০৯ (Monitoring of Employment Survey 2009), বিবিএস।

টীকা: *চিহ্নিত বছরগুলোর উপাত্ত ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকদের জন্য।

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (Public Food Distribution System)

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রায়শ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি আঘাত হানে। খাদ্য লভ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য প্রাপ্তি বাড়ানোর মাধ্যমে গরিবদের খাদ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারি খাদ্য বিতরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রয়োজন। বাংলাদেশে অনেকগুলো খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। তবে প্রতিটিরই নিজস্ব লক্ষ্যের পাশাপাশি নির্দিষ্ট টার্গেট জনগোষ্ঠী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ত্রাণ কর্মসূচি আছে যাদের লক্ষ্য ত্রাণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ থেকে জনগণকে তাৎক্ষণিক পরিত্রাণ দেয়া। অন্য কর্মসূচিগুলোরও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য রয়েছে।[১৬] কর্মসূচিগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো ত্রাণ সহায়তা প্রদান তথাপি বেশিরভাগ টার্গেটেড কর্মসূচি ত্রাণের পরিবর্তে উন্নয়নে বেশি গুর"ত্বারোপ করছে।

দরিদ্র জনগণের কাছে খাদ্য বিতরণের বিদ্যমান ব্যবস্থা সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে রেশনিং (গ্রাম ও শহর এলাকায়) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে কারণ সঠিকভাবে বাস্ড়বায়নে এ কর্মসূচি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিকল্প হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং ভালনারেবল গ্র"প ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি (VGD)। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (PFDS) আকার ও গঠনে গত দশকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে (সারণি ৩.৬)। পিএফডিএস এর আকার হ্রাস পেলেও টার্গেটেড খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ বেড়েছে। পিএফডিএস এর মোট খাদ্যশস্যের বিতরণের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ এসব কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।[১৭] অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ পিএফডিএস এর ভর্তুকিকৃত বিক্রয় চ্যানেলের (monetised channels) মাধ্যমে বণ্টিত হচ্ছে। ভর্তুকিকৃত বিক্রয় চ্যানেল থেকে টার্গেটেড চ্যানেলে উত্তরণের ফলে পিএফডিএস এর দক্ষতার সার্বিক উন্নতি হয়েছে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে (ডরস, সাহাবউদ্দিন ও ফরিদ ২০০৪)।

সারণি ৩.৬

বাংলাদেশে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ

('০০০ মেট্রিক টন, বার্ষিক গড়)

[১৬] যেমন পলণ্টী অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ত্বরান্বিতকরণ এবং মানব পুঁজির উন্নয়ন।

[১৭] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্যশস্যের বার্ষিক বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি উপকারভোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। যেমন ২০০৮-০৯ সালে বার্ষিক বিতরণের পরিমাণ ছিল ২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০০৯-১০ সালে প্রাক্কলিত বিতরণের পরিমাণ ছিল ২.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

কর্মসূচি	১৯৮৯/৯০-১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩-১৯৯৬/৯৭	২০০১/০২-২০০৫/০৬	২০০৬/০৭-২০০৯/১০
বিক্রয় চ্যানেল (Monetised Channel)				
সংবিধিবদ্ধ রেশনিং (SR)	১৮৭	১১	০	০
পলণ্টী রেশনিং (PR)	৩৭৬	০	০	০
জর"রি অগ্রাধিকার (EP)	১৪৫	১৭২	২৩১	১২৬
অন্যান্য অগ্রাধিকার (OP)	২৩২	১১	১৮	২১
বৃহৎ কর্মীদের প্রতিষ্ঠান (LEI)	৪৫	১৭	১১	১১
খোলা বাজারে বিক্রয় (OMS)	১৩৭	২০০	১৫২	২৯৫
ন্যায্য মূল্যের কার্ড	০	০	১০	০
ময়দার মিল	২৩৫	৩৯	৪৯	০
পলণ্টী চাকা	৯৬	২১	৭	০
অন্যান্য/নিলাম	০.০	৭	০	৪০
সাব-টোটাল	১,৪৫৬	৪৮২	৪৭৮	৫৬৩
	(৬৩%)	(৩৩%)	(৩৪%)	(৩১%)
বিক্রয় বহির্ভূত চ্যানেল (Non-monetised Channel)				
কাজের বিনিময়ে খাদ্য (FFW)	৪৭১	৪৪৪	৩০২	২৬৩
টেস্ট রিলিফ (TR)	১৫৩	১০১	১৩২	২৪২
ভালনারেবল গ্র"প ডেভেলপমেন্ট (VGD)	২১৪	১৬৭	১৯৪	২৪৫
গ্রাটুইটাস রিলিফ (GR)	০	৩০	৪২	৩৮
খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা (FEE)	০	১৫৪	৪০	০
ভালনারেবল গ্র"প ফিডিং (VGF)	০	০	১১১	৩৫৯
অন্যান্য	০	৬৪	৮৮	৮১
সাব-টোটাল	**৮৩৮**	**৯৬১**	**৯০৯**	**১,২২৮**
	(৩৭%)	(৬৭%)	(৬৬%)	(৬৯%)
সর্বমোট	২,২৯৪	১,৪৪৩	১,৩৮৭	১,৭৯১
	(১০০%)	(১০০%)	(১০০%)	(১০০%)

উৎস: সাহাবউদ্দিন ও দেব (২০১০)।

টীকা: বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যাগুলো পিএফডিএস এর আওতায় বিক্রয় এবং বিক্রয় বহির্ভূত চ্যানেলের মাধ্যমে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের শতাংশ নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রবণতা: অর্থনৈতিক প্রবেশগম্যতা (Economic Accessibility)

সাধারণত দরিদ্ররা খাদ্য নিরাপত্তাহীন হয়ে থাকে। ফলে খানা পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্র"ত ও টেকসইভাবে দারিদ্র্য হ্রাস করা প্রয়োজন। খাদ্যে জনগণের অর্থনৈতিক প্রবেশগম্যতা বোঝা যায় দেশের দারিদ্র্য প্রবণতা থেকে। দারিদ্র্য প্রবণতা পরিমাপে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য উপাত্তের একমাত্র উৎস হলো বিবিএস পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ। এ জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে পরিমাপকৃত দারিদ্র্য প্রবণতা সারণি ৩.৭-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৭

বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রবণতা: ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০১০

বছর	মাথা গণনা অনুপাত (%) (Head Count Ratio)			দরিদ্র লোকের সংখ্যা (মিলিয়ন)		
	গ্রাম	শহর	জাতীয় পর্যায়	গ্রাম	শহর	জাতীয় পর্যায়
১৯৮৩/৮৪	৫৯.৬	৫০.২	৫৮.৫	৫০.৩	৫.৬	৫৫.৯
১৯৮৮/৮৯	৫৯.২	৪৩.৯	৫৭.১	৫৪.১	৬.২	৬০.৩
১৯৯১/৯২	৬১.২	৪৪.৯	৫৮.৮	৫৭.৬	৬.৩	৬৩.৯
১৯৯৫/৯৬	৫৫.২	২৯.৪	৫১.০	৫৩.৬	৫.৮	৫৯.৪
২০০০	৫৩.০	৩৬.৬	৪৯.৮	৫৩.৪	৯.৩	৬২.৭
২০০৫	৪৩.৮	২৮.৪	৪০.০	৪৫.৮	৯.৭	৫৫.৫
২০১০	৩৫.২	২১.৩	৩১.৫	৩৮.৭	৭.৬	৪৬.৩

উৎস: মুজেরী (২০০০) এবং বিবিএস (২০০৭, ২০১১)।

টীকা: মাথা গণনা অনুপাত বোঝাচ্ছে উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানকারী জনগণের শতকরা হারকে (CBN পদ্ধতিতে হিসাবকৃত)।

দারিদ্র্যের হার (মাথা গণনা অনুপাতের ভিত্তিতে পরিমাপকৃত) ১৯৮৩-৮৪ সালের ৫৮.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ হয়েছে। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও শহর এলাকার চেয়ে গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি। এ পরিমাপ থেকে দুটো বিপরীতধর্মী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯৫-৯৬ এ সময়কালের মধ্যে গ্রামীণ দারিদ্র্যের চেয়ে নগর দারিদ্র্য দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে— ৫০.২ শতাংশ থেকে কমে ২৯.৪ শতাংশ হয়েছে। এ সময়কালে গ্রামীণ দারিদ্র্য অতি সামান্য কমেছে— ১৯৮৩-৮৪ সালের ৫৯.৬ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৫.২ শতাংশ হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৯৫-২০১০ সময়কালে গ্রামীণ দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলেও (১৯৯৫-৯৬ সালের ৫৫.২ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৩৫.২ শতাংশ হয়েছে) নগর দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম হারে হ্রাস পেয়েছে (২৯.৪ শতাংশ থেকে কমে ২১.৩ শতাংশ হয়েছে)।

১৯৮৪-২০১০ সময়কালে দরিদ্র লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন কমে গেলেও মোট জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫২ মিলিয়ন। গ্রাম এলাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪ সালের ৫০.৩ মিলিয়ন থেকে কমে ২০১০ সালে ৩৮.৭ মিলিয়ন হয়েছে অর্থাৎ ১১.৬ মিলিয়ন কমেছে। অন্যদিকে শহর এলাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যা একই সময়কালে বেড়েছে ২ মিলিয়ন (৫.৬ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৭.৬ মিলিয়ন হয়েছে)।

চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা (Physical Accessibility)

খাদ্যনিরাপত্তার সঠিক চিত্র লাভ করার জন্য চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা নিরূপণ করা দরকার। স্থায়ী দারিদ্র্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠী পুষ্টিগত দিক দিয়ে চরমভাবে বঞ্চিত। প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি (DCI) অনুসরণ করে বিবিএস কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিমাপকৃত দারিদ্র্যের হার থেকে পুষ্টিগতভাবে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে (সারণি ৩.৮)।

সারণি ৩.৮

মাথা গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য প্রবণতা: ১৯৮৫-৮৬ থেকে ২০০৫

জরিপ বছর	দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ও শতকরা হার		
	জাতীয় পর্যায়	গ্রাম	শহর

	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (শতকরা হার)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (শতকরা হার)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (শতকরা হার)
দারিদ্র্য রেখা ১: দারিদ্র্য (দৈনিক মাথাপিছু ২১১২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ)						
২০০৫	৫৬.১	৪০.৪	৪১.৩	৩৯.৫	১৪.৮	৪৩.২
২০০০	৫৫.৮	৪৪.৩	৪২.৬	৪২.৩	১৩.২	৫২.৫
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
১৯৮৮-৮৯	৪৯.৭	৪৭.৮	৪৩.৪	৪৭.৮	৬.৩	৪৭.৬
১৯৮৫-৮৬	৫৫.৩	৫৫.৭	৪৭.৪	৫৪.৭	৭.৯	৬২.৬
দারিদ্র্য রেখা ২: চরম দারিদ্র্য (দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ)						
২০০৫	২৭.১	১৯.৫	১৮.৭	১৭.৯	৮.৪	২৪.৪
২০০০	২৪.৯	২০.০	১৮.৮	১৮.৭	৬.০	২৫.০
১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৬	৫.২	২৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩
১৯৮৮-৮৯	২৯.৫	২৮.৪	২৬.০	২৮.৬	৩.৫	২৬.৪
১৯৮৫-৮৬	২৬.৭	২৬.৯	২২.৮	২৬.৩	৩.৯	৩০.৭

উৎস: বিবিএস (২০০১, ২০০৭)।

দারিদ্র্যের হার (মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ দৈনিক ২,১২২ ক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে) ১৯৮৫-৮৬ সালের ৫৫.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০০০ সালে ৪৪.৩ শতাংশ এবং ২০০৫ সালে আরও কমে ৪০.৪ শতাংশ হয়েছে। যদিও ১৯৮৫-৮৬ সালের তুলনায় ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৯১-৯২ সময়কালে চরম দারিদ্র্যের হার (মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ দৈনিক ১,৮০৫ ক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে) সামান্য বেড়েছে, ২০০০ সালে তা কমে ২০ শতাংশে পৌঁছে এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ড় প্রায় একই হারে স্থির ছিল।[১৯]

পুষ্টিগত বঞ্চনা অন্যতম একটি মৌলিক বঞ্চনা। ১৯৮১ সালে জাতীয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল (nationally representative) জরিপে দেখা গেছে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমন বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবারে অপুষ্টির মাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে। এ জরিপ অনুসারে একটি গ্রামীণ পরিবার তার ক্যালরি চাহিদার ৮৭ শতাংশ পূরণ করতে পারে। বিশ বছরের কম বয়সী ছেলে ও মেয়ে বয়স গ্র"পের কেউই তাদের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এসব বয়স গ্র"পে বয়স যত কম হয় পুষ্টি ঘাটতির পরিমাণ তত বেশি হয়। পরিবারে খাদ্যের ত্র"টিপূর্ণ বণ্টন লক্ষ করা যায়। সাধারণত মায়েরা ও অল্প বয়সী সন্ড়ানরাই এ বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।[২০]

৩.৩। প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বিগত দুই দশকে ধান উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্যের লভ্যতা সমস্যা অনেকটা কমেছে। তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তার অন্য দুটো দিকের—দরিদ্রদের আয় সহায়তার মাধ্যমে খাদ্যে প্রবেশাধিকার এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টি—বেশি গুর"ত্ব পাচ্ছে। দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তাবিধানে পিএফডিএস বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ভূমিকা গুর"ত্বপূর্ণ।

পিএফডিএস এর কার্যকারিতা বাড়াতে সরকারি মজুদ ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। পিএফডিএস এর র"টিন প্রয়োজন মেটাতে সরকারকে রোলিং স্টক (rolling stock) এবং এবং

[১৯] এক্ষেত্রে গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে গ্রাম এলাকায় দরিদ্র ও অসহায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন লোকের সংখ্যা ৪.১ মিলিয়ন হ্রাস পেলেও শহর এলাকায় এদের সংখ্যা ৪.৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

[২০] ১৯৯০-৯১ সালে বিআইডিএস কর্তৃক পরিচালিত পুষ্টি জরিপেও পরিবারে খাদ্য বন্টনে বৈষম্যের বিষয়ে একই চিত্র পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যশস্যের জরুরি বিতরণের জন্য ন্যূনতম বাফার স্টক (buffer stock) বজায় রাখতে হয়। এজন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ও বিতরণ করা হবে তার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, গুদামজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি এবং বিদ্যমান মজুদকরণ ব্যবস্থার পরিবীক্ষণ জোরদার করা প্রয়োজন।

খাদ্যমূল্যের ঋতুভিত্তিক পার্থক্য হওয়ার কারণ হলো প্রধান ফসলসমূহের ফলন উত্তোলনের সময়ের ভিন্নতা। ঋতুভিত্তিক মূল্যের ওঠানামাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার যে নীতি হাতিয়ার (policy instruments) ব্যবহার করে থাকে সেগুলো হলো: (১) কৃষকদের জন্য ন্যূনতম মূল্য (floor price) বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচির মাধ্যমে বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করা এবং (২) খাদ্যশস্যের মূল্য অত্যধিক বেড়ে যাওয়া রোধে খোলা বাজারে বিক্রয় কর্মসূচি চালু করা। বাম্পার ফলনের পর সরকারকে বাজারের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয় বাজার মূল্যকে সহায়তা প্রদান এবং কৃষকদের উৎপাদনে প্রণোদনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। খাদ্যশস্যের সঠিক সংগ্রহ মূল্য (procurement price) নির্ধারণ, যা কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহ দেয় এবং একইসাথে সরকারি ব্যয়ের সাশ্রয় করে, একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমনের চেয়ে সেচের মাধ্যমে চাষকৃত বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়া অধিকতর সহজ। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৯ সময়কালে ১৩ বছরের মধ্যে ৯ বছরই বোরো ধান সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশের বেশি অর্জিত হয়েছে এবং মাত্র এক বছর লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে আমন সংগ্রহে ১৩ বছরের মধ্যে মাত্র ২ বছর লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশের বেশি এবং ১২ বছরের মধ্যে ৮ বছর গড়ে লক্ষ্যমাত্রার ১৮ শতাংশ পূরণ হয়েছে।[১০] নব্বই দশকের শেষ দিকে বোরো ফসলের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য ৪ বছরের মধ্যে ৩ বছরই ছিল অত্যন্ত বেশি। এর ফলে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ খরচ এবং যারা সংগ্রহ কেন্দ্রে বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছিল তারা লাভবান হয়েছিল। অধিকন্তু বাজার মূল্যের চেয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হলে অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবণতা (rent seeking behaviour) ও দুর্নীতি (খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে) উৎসাহিত হয়। অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচি সফল না হওয়ার একটি কারণ হলো ভালো ফলনের বছরেও সরকার কর্তৃক অত্যধিক আমদানি করা। এর ফলে গুদামগুলোতে খাদ্যশস্য ধারণের কোনো জায়গা না থাকায় পরবর্তী ফসলের সময় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার সামর্থ্য সীমিত হয়ে পড়ে। সংগ্রহ কেন্দ্রে (procurement center) কৃষকদের প্রবেশাধিকার সীমিত থাকার কারণে কৃষকরা কম দামে ব্যবসায়ীদের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে বাধ্য হয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহের একটা বড় অংশই সংগৃহীত হয় বৃহৎ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে; ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের কাছ থেকে নয় (সাহাবউদ্দিন ও ইসলাম ১৯৯৯)। সরকারের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে কৃষকদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য নব্বই দশকের পর থেকে বছরে গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সহায়তা করেছে। তবে সার্বিক দারিদ্র্য হার এখনো বেশ উচুঁতে রয়ে গেছে। ২০০৫ সালের খাদ্য দারিদ্র্য পরিমাপ অনুসারে দেশের এক-চতুর্থাংশ লোক এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার খেতে পারে না। স্থায়ীভাবে অভুক্ত (chronically underfed) ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোনো সম্পদ নেই যা দিয়ে তারা মরা মৌসুমে (lean season) খাদ্যের অভাবকে বা অসুস্থতা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের আঘাতকে মোকাবিলা করতে পারে। চরম দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ও জীবিকার (livelihood) সুযোগ বাড়াতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করা প্রয়োজন।

---

[১০] সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতি মোটামুটি একই রয়ে গেছে। ২০০০-২০০৯ সময়কালে ১০ বছরের মধ্যে ৮ বছরই বোরো ধানের সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশের বেশি পূরণ হয়েছে এবং কেবল ১ বছর (২০০৭ সাল) লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ পূরণ হয়েছে। অন্যদিকে আমন ধানের ক্ষেত্রে ১০ বছরের মধ্যে কেবল ২ বছর আমন ধান সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশের বেশি পূরণ হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে গরিব লোকদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিছু কিছু কর্মসূচির কার্যক্রম শুর" হয় সত্তর দশকের মাঝামাঝি বা একেবারে গোড়ার দিকে। ক্রমান্বয়ে এসব কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো ও বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উলেণ্টখযোগ্য পরিবর্তনগুলো হলো ত্রাণ কর্মসূচির উন্নয়ন কর্মসূচিতে উত্তরণ, রেশন দামের ভর্তুকিকে টার্গেট খাদ্য বণ্টনে রূপান্ড়র এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বাস্ড়বায়নে এনজিও ও ক্ষুদ্র ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা রয়ে গেছে। প্রথমত, দরিদ্রদের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অর্থনৈতিক অসহায়ত্বকে প্রশমন করে। শিশু, বয়স্ক এবং ক্যাশ বা খাদ্যভিত্তিক পূর্ত কর্মসূচিতে (Public Works Programme) কঠোর শারীরিক শ্রম করতে অক্ষমদের জন্যও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (social protection system) থাকা আরও বেশি প্রয়োজন। যেসব কর্মসূচি বয়স্ক ও অক্ষম লোকদের সহায়তা প্রদান করছে সেসব কর্মসূচির আওতা ও পরিসর অত্যন্ড় সীমিত এবং ভাতা ও খাদ্য সহায়তার পরিমাণ অপ্রতুল। তৃতীয়ত, নগর দরিদ্রদের জন্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই। ২০০০ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে নগর দরিদ্রদের সংখ্যা ৪.৩ মিলিয়ন বেড়েছে। দ্র"ত নগরায়ণের কারণে নগর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নগর দরিদ্রদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক বেষ্টনী বা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৩.৪। খাদ্যে প্রাপ্তি বাড়াতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৮টি খাদ্য ও নগদ আর্থিক সহায়তা ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চালু রয়েছে। প্রতিটি কর্মসূচিকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে (যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, দরিদ্রদেরকে শিক্ষা প্রণোদনা প্রদান, দুর্যোগজনিত প্রভাব প্রশমন, বা সুবিধাবঞ্চিত গ্র"প যেমন বয়স্ক ও অক্ষমদের জীবিকার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি) শ্রেণীভাগ করা যায় (আহমেদ ও অন্যান্য ২০১০)।

সারণি ৩.৯-এ ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৪-০৫ সময়কালে বিভিন্ন টার্গেটেড কর্মসূচির জন্য সরকারি ব্যয়ের ধারা দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত ১৫ বছরে এসব কর্মসূচিতে সরকারি ব্যয় দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯] এটি মূলত নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে এই কর্মসূচির আওতা ও পরিসর সম্প্রসারণের কারণে সম্ভব হয়েছে। সার্বিক দেশজ উৎপাদন (GDP) এর শতাংশ হিসেবে টার্গেটেড কর্মসূচির জন্য মোট সরকারি ব্যয় নব্বই দশকে যেখানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে (২০০০/০১-২০০৪/০৫) তা হ্রাস পেয়েছে।[১০]

সারণি ৩.৯

বাংলাদেশে টার্গেটেড কর্মসূচিতে সরকারি ব্যয়ের ধারা: ১৯৯০/৯১ থেকে ২০০৪/০৫

(কোটি টাকা)

বছর	কাজের বিনিময়ে খাদ্য	জিআর/ টিআর	ভিজিডি	ভিজিএফ	এফএফই	অন্যান্য	মোট	জিডিপি	জিডিপির শতাংশ হিসেবে
১৯৯০/৯১	৪২৪.৮০	০	৩৮৭.০০	০	০	০	৮১১.৮১	১১০৫২০	০.৭৩

[৯] সাম্প্রতিক বছরগুলোর জন্য উপাত্ত পাওয়া যায় তবে এগুলো কর্মসূচির সংজ্ঞাগত পরিবর্তনের কারণে তুলনীয় নয়।

[১০] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে- ২০০৭-০৮ সালের ১১৪৬৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ সালে ১৩৮৪৫ কোটি টাকা এবং ২০০৯-১০ সালে ১৫৯৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ২০০৮ সালে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি (২০০৭-০৮ সালের খাদ্য মূল্যের সংকট প্রশমনের জন্য) এবং হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প প্রবর্তনের কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারের বরাদ্দ গত দুই বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে (আহমেদ ও অন্যান্য ২০১০)।

							(৯৭৩.৩৯)		
১৯৯১/৯২	৪৩২.৭৭	৩৯৩.৮২	০	০	০	০	৮২৬.৫৯ (৯৬২.৪৯)	১১৯৫৪২	০.৬৯
১৯৯২/৯৩	৩৭৩.৯২	২৬৭.৭৯	০	০	০	০	৬৪১.৭১ (৭৪৫.১৫)	১২৫৩৬৯	০.৫১
১৯৯৩/৯৪	৩৮৪.৩৬	৩০২.৫৮	০	০	৬৮.৩২	০	৭৫৫.২৬ (৮৪৫.০৯)	১৩৫৪১২	০.৫৬
১৯৯৪/৯৫	৭৫১.৭১	৩৪৬.৫১	০	০	১৯৩.৪৬	২.০১	১২৯৩.৬৯ (১৩৮৪.৪৪)	১৫২৫১৮	০.৮৫
১৯৯৫/৯৬	৫৫৮.৫৩	৪০০.৭৬	০	০	২৬৭.৪৯	১.৭৪	১২২৬.৭৮ (১২২৬.৭৮)	১৬৬৩২৪	০.৭৪
১৯৯৬/৯৭	৮১০.৮১	২৫৬.১০	২১৫.২৭	০	৩২৯.৫৩	১৫.২৪	১৬২৬.৯৫ (১৫৭৮.১৮)	১৮০৭০১	০.৯০
১৯৯৭/৯৮	৮৩৬.০০	২৫৮.৭১	২২৫.০৯	৭৬.২৪	৩৭৪.৯৮	১.৫৩	১৭৭২.৫৫ (১৬৩৩.২৪)	২০০১৭৭	০.৮৯
১৯৯৮/৯৯	৭১৫.৫৮	২১০.২৩	২০৮.৯০	৫৮৪.৮১	৩৯৫.৪৩	৬৫.৮৮	২১৮০.৮৩ (১৯২০.২৫)	২১৯৬৯৭	০.৯৯
১৯৯৯/০০	৮০৬.০০	২৭২.০০	২২৮.০০	২২৯.০০	৩৯৩.৫৭	১.০০	১৯২৯.৫৭ (১৬৩১.৬৩)	২৩৭০৮৬	০.৮১
২০০০/০১	৮৮৮.১৯	১৫৯.৭৫	২৩৬.৯০	২৯৭.১১	৩৪৬.১৪	৪০.০০	১৯৬৮.০৮ (১৬৭৪.৯৬)	২৫৩৫৫০	০.৭৮
২০০১/০২	৬৮১.৭৩	১৯৬.৮০	২৩৪.৯৬	১২৬.৬৭	৩৮৭.০৯	৪৩.০০	১৬৭০.২৪ (১৩৭৬.৯৫)	২৭৩২০০	০.৬১
২০০২/০৩	৪৩২.৪৬	১৫৩.৬৮	২৩০.৭৯	১০৪.০৮	৬২৩.৩০	৪২.০০	১৫৮৬.৩১ (১২৫১.০৩)	৩০০৫৮০	০.৫২
২০০৩/০৪	৪৪১.৪৯	১৬০.৫৬	২২৩.৭৩	১৭৫.৮২	৬১১.৪২	৪৬.০০	১৬৫৯.০২ (১২৫৫.৮৮)	৩৩২৯৭০	০.৫০
২০০৪/০৫	৫৪১.৬২	১৮২.৭২	২১৭.৫৩	১০৮.৭৬	৬৫২.৫২	৫০.০০	১৭৫৩.১৪ (১২৬৩.০৭)	৩৭০৭১০	০.৪৭

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ (বিভিন্ন বছর), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৮/৯৯ এবং ১৯৯৯/২০০০, খাদ্য নীতি পরিবীক্ষণ ইউনিট, বাংলাদেশ সরকার।

টীকা: বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাগুলো ১৯৯৫/৯৬ সালের স্থির মূল্যে টার্গেটেড কর্মসূচিগুলোর মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ/হিসাব।

৪। খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার (Utilization of Food)

৪.১। বয়স্ক ও শিশুদের পুষ্টি অবস্থা

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পুষ্টিগত অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় (হোসেন ও দেব ২০০৯)। জাতীয় পুষ্টি জরিপে (আইএনএফএস কর্তৃক পরিচালিত) নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ড় খাদ্যশক্তি গ্রহণের (energy intake) পরিমাণ অব্যাহত হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। গ্রাম এলাকায় জনগণের মাথাপিছু খাদ্যশক্তি গ্রহণের পরিমাণ ১৯৬২-৬৪ সালের ২২৫১ কিলো ক্যালরি থেকে কমে ১৯৭৫-৭৬ সালে ২০৯৪ কিলো ক্যালরি, ১৯৮১-৮২ সালে ১৯৪৩ কিলো ক্যালরি এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে আরও কমে ১৮৯২ কিলো ক্যালরিতে দাঁড়ায় (সারণি ৪.১)। প্রোটিন গ্রহণের (protein intake) ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ আরও বেশি। শহর এলাকায় অবশ্য মাথাপিছু খাদ্যশক্তি এবং প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ১৯৬২-৬৪ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ড় মোটামুটি একই অবস্থায় রয়েছে। পক্ষান্ড়রে খানা আয় ও ব্যয় জরিপে (HIES) দেখা গেছে, আশি ও নব্বই দশকের প্রথমদিকে গ্রাম এলাকার জনগণের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়লেও মাথাপিছু দানাদার খাদ্যশস্যের ভোগ কমার কারণে শহর এলাকায় ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমেছে। ১৯৯১-৯২ এবং ২০০০ সময়কালের মধ্যে শহর এলাকায় মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২,২৫৮ কিলো ক্যালরি থেকে কমে ২,১৫০ কিলো ক্যালরিতে দাঁড়ায়। তাই বিভিন্ন

উৎস থেকে দেশে nutritional status এর প্রবণতা সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে (হোসেন ও দেব ২০০৯)।

সারণি ৪.১

বাংলাদেশে নিউট্রিয়েন্ট (nutrient) গ্রহণের পরিমাণে পরিবর্তন: জাতীয় পুষ্টি জরিপসমূহ থেকে নেয়া হিসাব

নিউট্রিয়েন্ট	গ্রাম এলাকা				শহর এলাকা	
	১৯৬২-৬৪	১৯৭৫-৭৬	১৯৮১-৮২	১৯৯৫-৯৬	১৯৬২-৬৪	১৯৯৫-৯৬
খাদ্যশক্তি (কিলো ক্যালরি)	২২৫১	২০৯৪	১৯৪৩	১৮৯২	১৭৭৭	১৭৭৯
প্রোটিন (গ্রাম)	৫৭.৫	৫৮.৫	৪৮.৪	৪৬.৪	৪৯.৭	৪৯
চর্বি (গ্রাম)	১৭.৭	১২.২	৯.৮	১৪.১	২৬.১	২২.৫
কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	৪৭৬	৪৩৯	৪১২	৩৯৫	৩২৭	৩৪৫
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৩০৪	৩০৫	২৬০	৩২৮	২৩৯	৩৬৩
আয়রন (মিলিগ্রাম)	৯.৭	২২.২	২৩.৪	১১	৮.৭	১২.৭
ভিটামিন এ (I.U)	১৫৯০	৭৩০	৭৬৩	১৫৭১	১৮৭৫	২০১৭
নমুনা খানার সংখ্যা	১৭৫২	৬৭৪	৫৯৭	৯৭৫	৫৮৮	২৭০

উৎস: জাহান ও হোসেন (১৯৯৮)।

গত দুই দশকে অনেকগুলো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উলেণ্ঢখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে যেমন শিশুদের টীকা গ্রহণের হার বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যু ও মোট প্রজনন হার হ্রাস এবং নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি (মাহবুব-উল-হক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র ২০০৮)। এসব অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও হতাশাজনক। জনগণের এক বিরাট অংশ পর্যাপ্ত ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত। অপুষ্টির হার বিশেষ করে শিশু অপুষ্টির হার অত্যন্ড় বেশি। দেশের ৬ থেকে ৭১ মাস বয়সী সকল শিশুর ৫০ শতাংশের বেশি কম ওজনের বা বয়সের তুলনায় কম ওজনের। তাদের প্রায় ৫০ শতাংশ খর্বকায় বা বয়সের তুলনায় কম উচ্চতাবিশিষ্ট (সারণি ৪.২)।[১০] চরম ও স্থায়ী অপুষ্টি (acute and chronic malnutrition) সাধারণভাবে অত্যন্ড় বেশি। যেমন ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রায় ২০ শতাংশ অত্যন্ড় খর্বকায় এবং প্রায় ১২-১৪ শতাংশ অত্যন্ড় কমওজনবিশিষ্ট।

শিশু অপুষ্টির ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য প্রকট—শহরের চেয়ে গ্রামে পুষ্টিহীন শিশুর হার বেশি। গ্রাম এলাকার ৫০ শতাংশের বেশি শিশু বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার বা কম ওজনের, প্রায় ২০ শতাংশ কমউচ্চতা বিশিষ্ট এবং প্রায় ১৩ শতাংশ অত্যন্ড় কম ওজনের (সারণি ৪.২)। বিশ্বে কম ওজনে (২৫০০ গ্রামের কম) জন্ম নেয়া শিশুর হারের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম (হোসেন ও দেব ২০০৯)।

সারণি ৪.২

শিশু অপুষ্টির (৬-৭১ মাস) ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর ব্যবধান, ২০০০

(%)

অপুষ্টির অবস্থা	ক্ষীণ দেহ (wasted)	বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা (stunted)	বয়সের তুলনায় কম ওজন (underweight)
মাঝারি/চরম			
গ্রাম	১১.৯	৫০.৭	৫২.৮

[১০] ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিকস এর নির্দেশিত স্ট্যান্ডার্ড, যা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড এর মতো একই ধরনের, ব্যবহার করে দেখা গেছে, কম ওজনের শিশুর হার ১৯৯৬ সালের ৬০ শতাংশ হতে কমে ২০০৭ সালে ৪৬ শতাংশ হয়েছে। Stunting (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে এবং severe stunting এক দশকে (১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে) ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৬ শতাংশ হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে কম ওজনের শিশুর হার ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনার এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে জোরালো উদ্যোগ প্রয়োজন (সেন ও অন্যান্য ২০১০)।

শহর	১০.৮	৩৮.৩	৪২.২
চরম			
গ্রাম	১.০	১৯.৭	১৩.২
শহর	১.৮	১৫.১	৯.৬

উৎস: শিশু পুষ্টি জরিপ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০০০)।

৪.২। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি হলে আয় বৃদ্ধি পায়; ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দারিদ্র্য হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যগত ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে এবং বেশ কিছু সাফল্য ব্যয়সাশ্রয়ী (cost-effective) উপায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা (যা সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য) নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি বিধান, সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সম্প্রসারণ এবং সহজপ্রাপ্য সেবাপ্রদান ব্যবস্থা উৎসাহিতকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান সুবিধাদির আরও সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি সুসংহত করতে হবে। এটা কেবল সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় তাদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে নয় অধিকন্তু কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির পুনর্মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

৪.৩। উন্নত পুষ্টিগত ফলাফল অর্জনের জন্য কার্যকর খাদ্য ব্যবহার

উন্নত পুষ্টিগত ফলাফল লাভের জন্য খাদ্যের কার্যকর ব্যবহার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ড় তাৎপর্যবহ। দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টিগত প্রবণতা উৎসাহব্যঞ্জক কারণ এটা নির্দেশ করে যে শিশু ও মাতৃ পুষ্টিহীনতার মতো জটিল সমস্যা মোকাবিলায় সাফল্যলাভ সম্ভব। ১৯৬৬ এবং ২০০৭ সালের মধ্যে বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা ও মহিলাদের দৈহিক ভর সূচক ধীরে ধীরে হ্রাস পেলেও কম ওজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাম্প্রতিক সময়ে শণ্থথ হয়ে গেছে এবং উচ্চতার চেয়ে কম ওজন বা কৃশকায় দেহের শিশু ও মায়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।[৯] পুষ্টি পরিপোষকের বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত পর্যাপ্ত নয়। ফলে পুষ্টি পরিপোষকের, নারী ও শিশুদের মধ্যে, ঘাটতি বিষয়ে জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল (nationally representative) উপাত্তের সংগ্রহ নিশ্চিত করা একান্ড় প্রয়োজন।

মা ও শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে উলেণ্খযোগ্য হলো জাতীয় পুষ্টি নীতি এবং শিশু ফিডিং বিষয়ক জাতীয় কৌশল। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্ড়ক্ষেপের জন্য প্রধান জাতীয় নীতি (যেমন খাদ্য পরিপূরক ও শিশুদের উন্নত দুগ্ধ সেবন পদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শ দান) হলো জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি (NNP)। অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবাপ্রদানকারীদের মাধ্যমে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। নবজাতক ও অল্প বয়সী শিশুদের ফিডিং-এর উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রায় ও পরিসরে বাস্ড় বায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে নেয়া অনেক পদক্ষেপ বা কর্মসূচির অবস্থা বেশ ভালো। কতিপয় পদক্ষেপের সাফল্য ধরে রাখা ও তাদের পরিসর বৃদ্ধি (৯০-১০০%) এক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশে শিশু পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ে নেয়া প্রধান কর্মসূচিসমূহ থেকে দেখা গেছে, এসব কর্মসূচির পরিসর এখনো প্রয়োজনের ৫০ শতাংশের নিচে। আহমেদ ও আহমেদ (২০০৯) কর্তৃক সম্পাদিত এক সমীক্ষায় কতগুলো গুর"ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার কথা উলেণ্খ করা হয়েছে। দেশে যথাযথ পুষ্টিমান অর্জনের (nutritional outcome) জন্য এগুলোর বাস্ড়বায়ন একান্ড় প্রয়োজন।

[৯] যেসব পদক্ষেপ বিবেচনা করা প্রয়োজন সেগুলো হলো সন্ড়ান ভূমিষ্ট হওয়ার পর বুকের দুধ পান করানো, বয়স উপযোগী পরিপূরক খাবার দেয়া, মানসম্মত, বৈচিত্র্যময় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার গ্রহণ, প্রয়োজনবোধে চরম অপুষ্টির চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দেশে পয়:নিষ্কাশনের (sanitation) বিদ্যমান অবস্থা চিন্ড়ার বিষয়। দেশের ৯৫ শতাংশের বেশি পরিবারে মানসম্মত পানি ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২৫ শতাংশ লোক উন্নত পয়:নিষ্কাশনের সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে বা ব্যবহার করছে। ২০০৮ সালের গোড়ার দিকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির (HNPSP) উপর একটি মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নে অনেকগুলো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যেগুলো এ কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন (সেন এবং অন্যান্য ২০১০)।

পূর্বেই উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, খাদ্য ভোগের ক্ষেত্রে উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে আন্ড়খানা বৈষম্য রয়েছে। কেবল পরিবারের খাদ্য প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে যথাযথভাবে পুষ্টি সমস্যার সমাধান করা যাবে না। পুষ্টি শিক্ষা, খাদ্য ভেজাল, পানির গুণগত মানের উন্নয়ন, পয়:নিষ্কাশন ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়কে অন্ড়র্ভুক্ত করে পুষ্টি বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে ও ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। গণযোগাযোগ তথা গণমাধ্যমের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং জনগণের কাছে মানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারকে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে।

৫। উপসংহার

অভ্যন্ড়রীণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উলেণ্ঢখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির সমস্যা এখনও বহুলাংশে রয়ে গেছে। দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাব ও স্থায়ী পুষ্টিহীনতা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় খাদ্য নিরাপত্তা এখনও অর্জন করতে পারেনি। খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে কৌশল ও নীতির পুনর্মূল্যায়নের পাশাপাশি সকল স্টেকহোল্ডারের-সরকার, এনজিও, বেসরকারি খাত ও পরিবারের- কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা বাড়ানোর (খাদ্য কেনার আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে) মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখনও বাংলাদেশের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অন্ড়র্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন (১) অভ্যন্ড়রীণ উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের লভ্যতা বাড়ানো, (২) সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য লাভের সুযোগ বা খাদ্যে প্রবেশগম্যতা বাড়ানো, এবং (৩) খাদ্য ব্যবহারের কার্যকারিতা বাড়ানো।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদকরণ ও বিতরণে সরকারের সম্পৃক্ততা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেক দেশে এটা দারিদ্র্য নিরসন ও দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানোর উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতীতে বাংলাদেশে খাদ্য শস্য বিতরণে সরকারের ভূমিকা বেশি ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি ও খাদ্য বাজারে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের কারণে সরকারের হস্ড়ক্ষেপের প্রয়োজন হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারকে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জর"রি ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়, টার্গেটেড কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের কাছে খাদ্য বিতরণ করতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের মূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। বৈশ্বিক সংকটের কারণে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে তার অভিঘাত মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে তাঁর ভূমিকা বাড়াতে হবে এবং পিএফডিএসকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

কৃষিখাতে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও গুণগত মান দ্র"ত হ্রাস পাওয়ার কারণে জনগণের খাদ্য যোগাতে বাংলাদেশকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আশির দশকের পর থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বিশেষ করে বোরো ধানের উপর নির্ভরতার কারণে খাদ্য শস্য উৎপাদনে উলেণ্ঢখযোগ্য

অগ্রগতি সত্ত্বেও কৃষিশস্যকে নানাধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায়শ খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ক্ষতি সাধন হয়। অনেক এলাকা জমির উর্বরতা হ্রাস, নিম্মানের বীজের ব্যবহার ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সম্পদের অপ্রতুলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার ব্যাহত হয়। অধিকন্তু সেচের পানির অদক্ষ ব্যবহার ও জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষি উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব আরও প্রকট আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এসব সমস্যার সাথে সাথে খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও সারের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এ কারণে সরকার স্বনির্ভরতার মাধ্যমে (self-reliance) খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার (self-sufficiency) মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের নীতি গ্রহণ করেছে। খাদ্য উৎপাদন (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে) বাড়ানোর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল এবং সম্পর্কিত নীতিমালা ও কর্মসূচি নিয়ে আরও চিন্ড়া-ভাবনা প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের গতি-প্রকৃতি এবং প্রতিকূল পরিবেশ (ব্যাপক বন্যা ও খরা), গ্রামীণ আয়, ঋণের বাজার ও পুষ্টির মধ্যে যে আন্ড়সংযোগ রয়েছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংকটকালে টার্গেটেড আয় হস্ড়ান্ড়র কর্মসূচি, ঋণ কর্মসূচি এবং শস্যবীমা কর্মসূচি দারিদ্র্য নিরসন ও খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব কর্মসূচিকে একটা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (social protection strategy) অংশ হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) রয়েছে। সে অনুযায়ী শস্য বহুমুখীকরণের জন্য সরকারের সহায়তামূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির (Structural Adjustment Programme) ফলে বাংলাদেশে কৃষিতে সরকারি সহায়তার পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। এছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কর্তৃক নির্দেশিত "গ্রীন বক্স" ও "বণ্ডু বক্স" এর অন্ড়র্ভুক্ত উপাদানসমূহের জন্যও অতি সামান্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে।

সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখতে হলে উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসার অব্যাহত রাখতে হবে। আন্ড়র্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রসমূহে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুবিধা/সুযোগ গ্রহণ করতে বাংলাদেশকে নতুন বীজ ও উৎপাদন প্রযুক্তি আমদানির সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণায় সরকারি বিনিয়োগ ভারত, পাকিস্ড়ান, শ্রীলংকা ও অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে কৃষির গুর"ত্বের কারণে কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

পুষ্টি সমস্যা নিরসনে একটি সমন্বিত কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন যাতে অন্ড়র্ভুক্ত থাকবে পুষ্টি শিক্ষা, খাদ্য সুরক্ষাকরণ, পানির গুণগত মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়। কেবল খাদ্যশস্যের লভ্যতা ও খাদ্য প্রাপ্তিতে দরিদ্র পরিবারের সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়িয়ে দেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধান করা যথেষ্ট হবে না।

দারিদ্র্য ও অপুষ্টির হার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ হলেও দেশের প্রায় ৫ কোটি লোক এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়ে গেছে। শুধু প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচিও নিতে হবে। তবে একথাও সত্য যে, কর্মসংস্থান ও আয়-উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষুধা

নির্মূলের জন্য একটি অধিকতর টেকসই সমাধান হলো উচ্চ প্রবৃদ্ধি। বর্তমানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেক দেশে অনুসৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (inclusive development) ও দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি (pro-poor growth) কৌশলের সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ।

দরিদ্র জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকের কাছে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। ইতোমধ্যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কৃষি ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং ভর্তুকির মাধ্যমে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এজন্য কোনো একক প্রচেষ্টা নয় বরং অংশীদারিত্বভিত্তিক (synergy in partnership) প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এ অংশীদারিত্ব সরকার ও বেসরকারি খাত বা সুশীল সমাজ সংগঠন, অথবা বহুপাক্ষিক সংস্থার মধ্যে এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে দুটো দেশের (তথ্য, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে) মধ্যে হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed et al. (2010): "Income Growth, Safety Nets and Public Food Distribution," Paper prepared for Bangladesh Food Security Investment Forum held on 26-27 May 2010, Organised by the Ministry of Food, Government of Bangladesh.

Ahmed, T. and A. M. S. Ahmed (2009): "Reducing the Burden of Malnutrition in Bangladesh," *British Medical Journal*, 339:b4490.

BBS (2000): *Statistical Pocketbook*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

———(2001): *Report of the Household Income and Expenditure Survey, 2000*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

——— (2007): *Report of the Household Income and Expenditure Survey 2005*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

———(2009): *Monitoring of Employment Survey 2009,* Bangladesh Bureau of Statistics.

———(2011): *Report of the Household Income and Expenditure Survey 2010*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

———(various years): *Labor Force Survey*, Bangladesh Bureau of Statistics.

Chowdhury, O.H. (1995): "Nutritional Dimension of Poverty," In: H.Z. Rahman and M. Hossain (eds), *Rethinking Rural Poverty*, New Delhi: Sage Publications.

Chowdhury, O.H. and Carlo del Ninno (1998): "Poverty, Household Food Security and Targeted Food Programmes," FMRSP Working Paper No. 5, Food Management and Research Support Project, Ministry of Food, Govt. of Bangladesh.

Deb, U. et al. (2009): "Rethinking Food Security Strategy : Self-sufficiency or Self-Reliance," Policy Brief No. 5, Prepared for the National Conference on "Market Volatility, Vulnerability and Food Security," organised by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and the UK Department for International Development (DFID) in April at Dhaka.

Dorosh, P. and Q. Shahabuddin (1999): "Price Stabilization and Public Foodgrain Distribution Policy Options to Enhance National Food Security," FMRSP Working Paper No.12, Food Management and Research Support Project, Ministry of Food, Government of the People's Republic Bangladesh.

Dorosh, P., Q. Shahabuddin and N. Farid (2004): "Price Stabilization and Food Stock Policy," In: *The 1998 Floods and Beyond: Towards Comprehensive Food Security in Bangladesh*, ed. P. Dorosh et al., Dhaka, Bangladesh and Washington D.C.: The University Press Limited and International Food Policy Research Institute.

GoB (2000): *Child Nutrition Survey of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh.

———(2009): *National Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (Revised) FY 2009-11*, Planning Commission, Government of Bangladesh.

———(various years): *Bangladesh Economic Review*, Ministry of Finance.

Hossain, M. (1996), "Agricultural Policies in Bangladesh : Evolution and Impact on Crop Production", Chapter 11 In: *State, Market and Development, Essays in Honor of Rehman Sobhan*, by Abu Abdullah and Azizur Rahman Khan, University Press Limited, Dhaka.

Hossain, M. and A. Bayes (2010): *Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh*, A.H. Development Publishing House, Dhaka.

Hossain, M. and U.K. Deb (2009): "Food Security and Containing Price Escalation: Facts and Implication for Policy," in Development of Bangladesh with Equity and Justice: Immediate Tasks for the New Government, Center for Policy Dialogue, Dhaka.

———(2010), "Volatility in Rice Prices and Policy Resources in Bangladesh," In David Dawe (ed), *The Rice Price Crises: Markets, Policies and Food Security*. London and Washington DC: Earthscan.

Jahan, K. and M. Hossain (1998): *Nature and Extent of Malnutrition in Bangladesh: National Nutrition Survey*, 1995-96, Dhaka: Institute of Food and Nutritional Science, University of Dhaka.

Mujeri, M.K. (2000): "Poverty Trends and Agricultural Growth Linkages," FMRSP Working Paper No. 26, Food Management and Research Support Project, Ministry of Food, Govt. of Bangladesh.

Mujeri, M.K. and Q. Shahabuddin (2012): *Food Security Situation in Bangladesh: Achievements, Challenges and Prospects*, Report Prepared for Australian Centre for Agricultural Research Agreement, University of Queensland, Australia.

Nandakumar, T. et al. (2010): "Food and Nutrition Security Status in India: Opportunities for Investment Partnerships," ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 16, Asian Development Bank.

Rahman, M. (2010): *Strengthening the Government's Institutional Capacity for Improving Food Security*, Final Report submitted to Asian Development Bank and Ministry of Agriculture, under Technical Assistance Program (TA 7101-BAN).

Sen, B. et al. (2010): "Food Utilization and Nutrition Security," Paper prepared for the Bangladesh Food Security Investment Forum held on 26-27 May 2010, Organised by the Ministry of Food, Government of Bangladesh.

Shahabuddin, Q. and U.K. Deb (2010): "Food Security and Human Development in Bangladesh," Background Paper prepared for *Food Security in South Asia, Human Development in South Asia 2010/11*, Mahbub-ul-Haq Human Development Center, Pakistan, Oxford University Press.

Shahabuddin, Q. (2010): "The Right to Food: Bangladesh Perspectives," *The Bangladesh Development Studies*, Vol. XXXIII, March-June 2010, Nos. 1 and 2.

Shahabuddin, Q. and K.M.N. Islam (1999): "Domestic Rice Procurement Programme in Bangladesh: An Evaluation," Food Management Research Support Project Working Paper No. 8, Washington D.C. and Dhaka: International Food Policy Research Institute and Food Management Research Support Project.

Shahabuddin, Q. et al. (2012): "Developing Non-crop Agriculture in Bangladesh: Present Status and Future Development," Background Paper for the Sixth Five Year Plan of Bangladesh 2011-2015, Volume 2, Economic Sectors, edited by M.K. Mujeri and Shamsul Alam, Bangladesh Institute of Development Studies and General Economics Division, Planning Commission, Government of Bangladesh.